আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ -৩

দারুল উলূম

(ইলমের প্রাঙ্গণ)

থেকে

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং

(ছিন্নমূল অসহায় পুনর্বাসন কেন্দ্র)

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন হাফিযাহুল্লাহ

আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ -৩

দারুল উলূম
(ইলমের প্রাঙ্গণ)
থেকে
এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং
(ছিন্নমূল অসহায় পুনর্বাসন কেন্দ্র)

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন হাফিযাহুল্লাহ

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুস সিদ্দীক
পান্থনিবাস, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী
মোবাইল : ০১৮৪৫-৯১৩৬১৩

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৮ খ্রি., জুমাদাল আখিরাহ : ১৪৩৯ হি.

দারুল উলূম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং

✧ প্রকাশক : মাকতাবাতুস সিদ্দীক
 ✧ পান্থনিবাস, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী

মূল্য : ১৮০/= টাকা মাত্র

সংশোধনী

আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ-২ "দারুল উলূম দেওবন্দ এর শত্রু-মিত্র" বইটির ২৪৩ পৃষ্ঠার দু'টি অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

এক. "দারুল উলূম দেওবন্দ এর শত্রু-মিত্র" ২৪৩ পৃষ্ঠায় একটি বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে **'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ'**। নামটি হবে **'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও ইসলাম'**।

দুই. "দারুল উলূম দেওবন্দ এর শত্রু-মিত্র" ২৪৩ পৃষ্ঠায় **'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ'** শিরনামের অধীনে জিহাদের যে সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলত 'মাসিক পাথেয়' পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যার ১৫ নং পৃষ্ঠা থেকে নেয়া।

'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও ইসলাম' নামক বইয়ের ১৩ নং পৃষ্ঠায় জিহাদের সংজ্ঞা নিম্নোক্ত ইবারতে করা হয়েছে।

"জিহাদ কী?

আরবীতে জিহাদ শব্দটির মূল হল 'আল্ জাহ্দু'। যার শাব্দিক অর্থ চূড়ান্ত চেষ্টা বা শ্রম ব্যয় করা। এর ইসলামিক পারিভাষিক অর্থ হল মানবকল্যাণে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। **এক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা**। এক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি দুটোকেই একসাথে সমান প্রাধান্য দিতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে যে শ্রম ব্যয় করা হবে সেটাই হবে জিহাদ। জিহাদের অনেকগুলো স্তর আছে। প্রথম স্তরে রয়েছে রিপু, প্রবৃত্তি এবং পশুত্বর বিরুদ্ধে নিজের ভিতরে মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটানোর জন্য সংগ্রাম বা চেষ্টা। এটাকে বলা হয় 'জিহাদ বিন নফস' অর্থাৎ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। নবী করীম (সা.) জিহাদ বিন নফ্‌স্‌কে 'জিহাদে আকবর' বলে অভিহিত করেছেন।"

আর সিরিজের ২৪৪ নং পৃষ্ঠায় 'দেবালয় রক্ষা করা ফরয জিহাদ' শিরনামে যা লেখা হয়েছে তা 'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও ইসলাম' নামক বইয়ের ১৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে।

ولا تكن للخائنين خصيما

এতে যা আছে

নির্বাচিত অংশ

দেখুন, লঙ্গরখানা, অনাথ আশ্রম বা ছিন্নমূল পুনর্বাসন কেন্দ্র এগুলোও ইসলামের পক্ষ থেকে অর্পিত একেকটি দায়িত্ব এবং অবস্থাভেদে ফরয-ওয়াজিব দায়িত্ব। এর অস্তিত্ব শুধু স্বীকার করলেই চলবে না, সে দায়িত্ব আদায়ও করতে হবে। কিন্তু এগুলো সর্বাবস্থায় মাদরাসা নয়। দারুল উলূম হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি ব্যবহার করতে গিয়ে শরীয়তের যে পরিমাণ অঙ্গ কেটে ও ছেটে ফেলতে হয়েছে, তার কতভাগ

এ শিরোনাম ব্যবহার করে পুনরুদ্ধার করা যাবে? এ কাটছাটের শরয়ী বিধান কী? এবং হারিয়ে যাওয়া সম্পদ আবার ফিরে পাওয়ার পথ কী?

ফ্রিজে পানিকে বরফ বানিয়ে রেখে রেখে আর কতকাল আমরা ঠাণ্ডার ওযরে তায়াম্মুম করতে থাকব? শরীয়ত আমাদেরকে কতকাল এর অনুমতি দেবে?

কিতাবের কথাগুলোকে বাস্তব জীবনে আনতে হবে। কিতাবের কথাগুলোকে যদি সবার আগে কিতাবওয়ালারাই ছুড়ে ফেলে দেয় তা হলে অন্যদের বিচার কে করবে?

পার্থিব উপায় উপকরণের শিক্ষা হোক বা ইসলাম শিক্ষা হোক সর্বাবস্থায় মাদরাসা হচ্ছে একটি শিক্ষালয়। কোন অবস্থাতেই এটা কোন সরাইখানা নয়। এটা কোন লঙ্গরখানা নয়। এটা কোন অনাথ আশ্রম নয়। এটা কোন ছিন্নমূল পুনর্বাসন কেন্দ্র নয়। এটা হচ্ছে জ্ঞানের সরোবর।

যে পৃথিবীতে কুফরী গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে জিহাদের দায়িত্ব আদায় করার মহড়া চলছে, কুরবানীর গরুর রক্ত দিয়ে শহীদ হওয়ার সাওয়াব পাওয়ার উৎসাহ দেয়া চলছে, মানুষের দ্বারে দ্বারে চাঁদার থলি নিয়ে ফিরে ফিরে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আদায়ের তৃপ্তি পরিতৃপ্তির ঢেকুর চলছে, ইসলাহী মুরুব্বীর ইসলাহী কোর্স শেষ হওয়ার পর খলিফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীনের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে -সে পৃথিবীতে লিল্লাহবোর্ডিংয়ের চাঁদা করে যাকাত উসূলকারীর দায়িত্ব আদায় করলে এতে আমরা নতুন করে অবাক হতে চাই না।

এসব ক্ষেত্রে জায়েয-নাজায়েযের প্রশ্ন করা হলেই নির্ধারিত একটি উত্তর পাওয়া যায় তা হল, 'এখানে আসলেই খালি সব জায়েয-নাজায়েয ভেসে ওঠে, আমরা কি সব জায়গায় জায়েয-নাজায়েয বেছে চলতে পারি? দ্বীন-ইলমে দ্বীন অস্তিত্বের সংকটে রয়েছে, আর আমরা আছি জায়েয-নাজায়েযের ফতোয়া নিয়ে' বা এ ধরনের অর্থবোধক কোন জবাব।

এতিমের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব খলিফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মুমিনীনের উপর আসার আগ পর্যন্ত প্রতিটি পর্বই হচ্ছে ব্যক্তিগত। এর মাঝে সামষ্টিক রূপের কোন সম্ভাবনা নেই। এতিমের জামাত তৈরি করার কোন

পদ্ধতি নেই। এতিমের ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কোন শিরোনামের কোন অস্তিত্ব নেই এবং প্রয়োজনও নেই।

দারুল উলূম দেওবন্দ তার পথ চলার দীর্ঘ এ জীবনে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি ব্যবহার করেনি। দারুল উলূম দেওবন্দ এ শিরোনাম ব্যবহার করলেও আমরা দলিলের মানদণ্ডেই তাকে মাপতাম। এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই।

দ্বীনকে কুরবান করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লড়াই। এমন পরিস্থিতিতেই সন্দেহ জাগে, আসলে লড়াইটা কিসের? দ্বীনের না দুনিয়ার। কেউ চাইলেই প্রশ্নের এ মুখ বন্ধ করতে পারবে না।

একটি কথা ছিল, মতলবের জন্য আমরা কত আকাবিরকে মঞ্চ থেকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছি তার কোন হিসাব নেই। **আরেকটি কথা ছিল,** লক্ষ আকাবিরের কোন একজনের জীবনের লক্ষ মুহূর্তের যে মুহূর্তটি দিয়ে আমার মতলব উদ্ধার সম্ভব সেটিকেই আমরা বড় থেকে বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

যেসকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সম্মান-ইজ্জত বৃদ্ধি পেত, সেসকল কাজে আজকের উম্মতের এমনকি উম্মতের কর্ণধারদেরও সম্মান ও ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর যেসকল কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ইজ্জত নষ্ট হয়ে যেত, সেসকল কাজে আজকের উম্মতের এবং উম্মতের কর্ণধারদের সম্মান ও ইজ্জত বেড়েই চলেছে।

কোন নিন্দুক যদি ব্যক্তিবিশেষের দুর্বলতা দিয়ে বা কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের বাহানা দিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দকে খাট করতে চায় তাহলে তা তার দুর্ভাগ্য। দারুল উলূম দেওবন্দ আপন আলোয় উদ্ভাসিত। স্বার্থের জন্য হয়তোবা কেউ দারুল উলূম দেওবন্দকে নিজের স্খলিত চিন্তার খাঁচায় আবদ্ধ করতে চাইবে, বা এ আলোর মিনারে টেক লাগিয়ে নিজের সাময়িক হীন মতলব উদ্ধার করে নিতে চাইবে। কিন্তু কাসেমী সন্তানদের চোখকে তারা কখনো ফাঁকি দিতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ আসলে অবস হয়ে গেছে। আর আমরা মনে করছি, আমাদের ধৈর্য ক্ষমতা বেড়েছে। সহনশীলতা বেড়েছে। ইলমের ওজন বেড়েছে। শরীরের ওজনকে আমরা ইলমের ওজন মনে করে বসে আছি। চাটুকারদের স্বার্থের করতালিকে আমরা জিবরীলের ঐশী ভালোবাসা মনে করে বসে আছি। হাঁস-মুরগি আর মৎস প্রকল্পের মাছের জীবনকে আমরা জান্নাতী জীবন ভেবে দিন-সপ্তাহ-মাস-বছর-যুগ এমনকি জীবনের পর জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি।

এতিম শরীয়তের পরিভাষায় এতিম থাকা অবস্থায় অনুভব করতে পারত না যে, সে একজন এতিম। তারা ভিন্ন প্রজাতির কিছু মানুষ। সাধারণ মানুষের পরিচয় ভিন্ন, আর তাদের পরিচয় ভিন্ন। পৃথিবীর মানুষ হচ্ছে আশ্রয়দাতা, আর তারা হচ্ছে আশ্রিত। পৃথিবীর সকল মানুষ হচ্ছে করুণার আধার, আর তারা হচ্ছে করুণার পাত্র।

কেউ বুশ-ব্লেয়ার-ট্রাম্প, প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট, নিউটন-কলম্বাস, আব্রাহাম লিংকন-রুশো-ভোল্টায়ার হতে পারবে। কিন্তু সে চতুষ্পদ জন্তুর কাতার থেকে উঠে এসে মানুষের কাতারে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই তাকে মাদরাসা ও মাদরাসা ওয়ালার কাছে ধর্ণা দিতে হবে।

আর এভাবেই আমাদের স্বপ্নগুলো ছোট থেকে আরো ছোট, এরপর আরো ছোট হয়ে চলেছে। আমরা ডিমের কুসুমের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ডিমের সাদা পানিতে ঝাঁপ দিয়েছি। আত্মতৃপ্তিতে বুকের পাঁজরের হাড্ডির মধ্যে কলিজা ঠাসাঠাসি অবস্থা। কিন্তু ডিমের খোসা ভাঙ্গার মত সৎ সাহস আজো আমাদের হয়নি।

শরীয়ত বিরোধী, রুচিবিরোধী, দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের জন্য মানহানীকর একটি শিরোনাম দেয়ার সময় শরীয়তকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই, দারুল উলূম দেওবন্দের অনুসরণে মাদরাসা দিয়ে তার শিরোনামে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং লাগানোর সময় দারুল উলূম দেওবন্দকেও জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই। আবার প্রকৃত অনুসারী হওয়ার দাবি করতেও কোন কার্পণ্য নেই! এটা কি মগের মুল্লুক না কি?!

যে কোন পরিস্থিতির জবাবে একটি আশংকাকে সামনে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করি। সে আশংকা হচ্ছে, 'যদি এভাবে না করা হত তাহলে দ্বীন ও

ইলমের এখন যতটুকু আছে তাও থাকতো না'। এই একটি আশংকার ঢাল ব্যবহার করে দ্বীনের বহু অবৈধ কাজকে আমরা বৈধতা দিয়ে চলেছি।

উম্মতের যারা দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন বা উম্মত মনে করছে আপনাদের কাঁধেই এসব কিছুর দায়িত্ব, সেসব দায়িত্বের জবাবদিহীর কথা একটু স্মরণ করুন। কিতাবকে ঘৃণা করা ত্যাগ করুন। দলিলকে উপেক্ষা করা ত্যাগ করুন।

দীর্ঘকাল ব্যাপী এবং অনেক দীর্ঘকাল ব্যাপী আমরা বহু 'নাই মামা'কে 'কানা মামা' ভেবে ধোঁকা খেয়ে চলেছি। আমাদের সে ধোঁকা খাওয়ার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন ওযরও নেই। আসলে শরীয়তে 'কানা মামা'র কোন অস্তিত্ব নেই। শরীয়ত কানা কোন মামাকে স্বীকার করে না।

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا

'ইলমের আঙ্গিনা' থেকে কখন আমরা ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে 'ছিন্নমূল অসহায় পুনর্বাসন কেন্দ্রে' ঢুকে পড়েছি তা আমরা হয়তো জানিও না। আমরা জানিও না কীভাবে একটি 'দারুল উলূম' একটি 'এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিং' -এ রূপান্তরিত হয়েছে এবং শত হাজার হামেলে দ্বীনের হৃদয়ে খুব সহজে এবং কোন প্রকার আপত্তিহীনভাবে গেড়ে বসে গেছে। দ্বীনের, ইলমের এবং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে ফেলেছে।

অথবা জানি। কিন্তু আমরা ছিলাম অসহায়, নিরুপায়। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখেছি। বুঝেছি। নীরবে কেঁদেছি। অথবা আমাদের মন তা কবুল করেনি। কিন্তু তার এত ভয়াবহ পরিণতি আমাদের কল্পনায় আসেনি। অথবা একটি সহজ শিরোনামের আড়ালে দ্বীনের কিছু কাজ করে যেতে চেয়েছি। অথবা إنما ترزقون بضعفائكم এর বাস্তব অনুশীলন করতে ও দেখতে চেয়েছি। অথবা বাস্তবেই এতিমদের জন্যই আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে চেয়েছি। অথবা আমাদের নবী এতিম ছিলেন, তাই এতিম হওয়াটাই আমাদের উসওয়ায়ে হাসানা এবং আমাদের গর্ব ও গৌরব।

কিন্তু আমাদের কি কখনো ভাবার সুযোগ হয়েছে যে, এর অর্জন কতটুকু এবং বিসর্জন কতটুকু? আমরা কি কখনো এ অধ্যায়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে দেখেছি? এ হিসাব মিলিয়ে দেখার কোন দায়িত্ব আমাদের উপর আছে কি না? হিসাব নিকাশের পর যে ফলাফল বের হবে তা দেখার মত সৎ সাহস আমাদের আছে কি না?

মনে রাখতে হবে, এ সাহস থাকুক আর না থাকুক হিসাব হয়েই যাবে এবং হিসাব হয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করে বিপদ এড়ানোর কোন কৌশল আমাদের জানা নেই। তাই আমাদের এবারের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত নিবেদন 'দারুল উলূম থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং'।

-যুবায়ের

দারুল উলূম কী?

দারুল উলূম হচ্ছে, বিদ্যানিকেতন, ইলমের আঙ্গিনা, জ্ঞানের আধার, বিজ্ঞানের সরোবর। প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবধারিত ফরয طلب العلم فريضة -এর দায়িত্ব আদায়ের অঙ্গন।

শেখার ফরয দায়িত্ব আদায়ের অঙ্গন, শেখানোর ফরয দায়িত্ব আদায়ের অঙ্গন। মুমিনের উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব ফরয আমলগুলো কী কী তা জানার ফরয দায়িত্বের অঙ্গন।

খালেককে খালেক হিসাবে জানার, মালিককে মালিক হিসাবে জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ইলমে ওহি চর্চার অঙ্গন। মানবসৃষ্টির মূল রহস্য কী? তা জানার একমাত্র অঙ্গন। মানব জীবনের ব্যবস্থাপত্র কী? মানবদেহের ওষুধ কী? পথ্য কী? তা জানার একমাত্র অঙ্গন। মানবাত্মার ওষুধ কী আর পথ্য কী? তা জানার একমাত্র অঙ্গন। মৃত্যুর আগে কী ছিল, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেমন থাকতে হবে, অর মৃত্যুর পর অনন্তকাল পর্যন্ত কী হবে? তা জানার একমাত্র টেকসই আঙ্গিনা।

মানবপ্রবাহের কল্যাণ কোথায় আর অকল্যাণ কোথায়? তা জানার একমাত্র আধার। ওষুধ কী আর বিষ কী? তা পার্থক্য করার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যম। বন্ধু কে আর শত্রু কে? তা চেনার একমাত্র আঙ্গিনা।

সভ্যতা, আধুনিকতা, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা, সংস্কার, চলমান পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারা, অসভ্যতা ও লাম্পট্যের টুটি চেপে ধরতে পারা, হীন স্বার্থের জন্য হানাহানির লাগাম টেনে ধরতে পারা, ক্ষমতার মোহ

থেকে নিবৃত করা, প্রতিটি সৃষ্টির হক তার হাতে পৌঁছে দেওয়া, জালিমের ঘাড় চেপে ধরা, মাজলুমের হাত ধরা, বদমাশদের রক্তচক্ষুকে উপড়ে ফেলা, সকল প্রকারের হকদারের কাছে হক পৌঁছে দেওয়া যে প্রতিষ্ঠান শেখায় তাকে বলা হয় দারুল উলূম।

মানবতা আর পশুত্ব, শান্তি আর অশান্তি, সাম্প্রদায়িকতা আর অসাম্প্রদায়িকতা, আলো আর অন্ধকার, প্রগতি আর পশ্চাদপদতা, স্বাধীনতা আর দাসত্ব, ইনসাফ আর জুলুম, ন্যায় বিচার আর স্বৈরাচার, মালিক আর চোর-ডাকাত, সাদা দিলের মানুষ আর লম্পট-বদমাশ এবং সর্বোপরি মানুষ ও অমানুষ চেনার একমাত্র এবং একমাত্র অঙ্গন হচ্ছে দারুল উলূম।

দারুল উলূম হচ্ছে, একজন মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য মন্ত্রী হওয়া জরুরী না কি মুসলমান হওয়া জরুরী? তা জানার আঙ্গিনা। মুসলমান না হয়েও একজন মানুষ মানবতাবাদী হতে পারে কি না? মুসলমান না হয়েও কেউ শান্তিবাদী হতে পারে কি না? মাগযূব আলাইহিম ও দ্ব-ললীন হয়েও কেউ শান্তির বার্তাবাহক হতে পারে কি না? সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনকারী 'মহামান্য' হতে পারে কি না? 'নাজাস' ও নাপাক হয়েও কেউ 'মহামান্য' ও 'মহোদয়' হতে পারে কি না? -এসব কিছু জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং একমাত্র বিদ্যাপীঠের নাম হচ্ছে 'দারুল উলূম' বা ইলমের আঙ্গিনা।

দারুল উলূম দেওবন্দ কী?

দারুল উলূম দেওবন্দ হচ্ছে, একটি দারুল উলূম বা ইলমের আঙ্গিনা যত গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে এবং যতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে জন্ম লাভ করে এবং বেড়ে ওঠে -বললে আশা করি অত্যুক্তি হবে না যে- সেসকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ইলমের একটি সরোবরের নাম হচ্ছে 'দারুল উলূম দেওবন্দ'। দারুল উলূম দেওবন্দ সেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্ম লাভ করেছে, পথ চলা শুরু করেছে এবং কালের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে চলেছে।

কোন নিন্দুক যদি ব্যক্তিবিশেষের দুর্বলতা দিয়ে বা কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের বাহানা দিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দকে খাট করতে চায় তাহলে তা তার দুর্ভাগ্য। দারুল উলূম দেওবন্দ আপন আলোয় উদ্ভাসিত। স্বার্থের জন্য হয়তোবা কেউ দারুল উলূম দেওবন্দকে নিজের স্খলিত চিন্তার খাঁচায় আবদ্ধ

করতে চাইবে, বা এ আলোর মিনারে টেক লাগিয়ে নিজের সাময়িক হীন মতলব উদ্ধার করে নিতে চাইবে। কিন্তু কাসেমী সন্তানদের চোখকে তারা কখনো ফাঁকি দিতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

দারুল উলূম দেওবন্দ এবং তার মানহাজ জন্মলগ্ন থেকেই তার সন্তানদেরকে সেসব কথাই শিখিয়ে আসছে যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেছেন, সেসব কথাই শিখিয়ে আসছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনব্যাপী সাহাবায়ে কেরামকে শিখিয়েছেন। শরীয়তের সেসব সিদ্ধান্তই বিলি করে চলেছে যা মুজতাহিদ, মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে উম্মতের জন্য সাজিয়ে দিয়ে গেছেন।

দারুল উলূম দেওবন্দ তার জন্ম থেকে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের ব্যখ্যা ও বিধানের তালীম দিয়ে আসছে এবং মুজতাহিদগণের নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলোর তালীম দিয়ে আসছে-

দারুল উলূম দেওবন্দের ইলম

(فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم) مكلف وهو العلم الذي لا يقدر المكلف بالجهل به كمعرفة الصانع وما يجب له وما يستحيل عليه، ومعرفة رسله وكيفية الفروض العينية، والمراد بالمعرفة الاعتقاد الجازم لا على طريق المتكلمين **(فيض القدير للمناوي، في بحث بيان حديث رقمه: ١١١٠)**

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ.﴾ **(الزمر: ٩)** قل -أيها الرسول-: هل يستوي الذين يعلمون ربهم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئًا من ذلك؟ لا يستوون. إنما يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. **(تفسير العز بن عبد السلام، دار ابن حزم - بيروت، ١/١٠٠٧)**

(قل هل يستوي الذين يعلمون) الذين يعلمون هذا فيعملون له والذين لا يعملونه ولا يعلمون به، أو الذين يعلمون أنهم ملاقو ربهم والذين لا يعلمون المشركون

الذين جعلوا لله أنداداً، أو الذين يعلمون نحن والذين لا يعلمون هم المرتابون في هذه الدنيا. (**تفسير العز بن عبد السلام**)

وهو العلم الذي لا يعذر المكلف في الجهل به، والعلم ستة أقسام: فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الكل وإلا أثم الكل، وفرض عين وهو ما يحتاجه المكلف في الفرض كوضوء وصلاة وصوم، لكن إنما يلزم تعلم الظواهر لا الدقائق والنوادر، ومن له مال زكوي يلزمه تعلم أحكام الزكاة الظاهرة، ومن يبيع ويشتري يلزمه تعلم أحكام المعاملة، ومن له زوجة يلزمه تعلم أحكام عشرة النساء وكذا من له قن، وكذا معرفة ما يحل ويحرم من مأكول ومشروب وملبوس... (**التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي، دار النشر، الرياض، ١/٣٢٩**)

ويجب على كل مكلّف تعلّم ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض والواجبات، ولمعرفة العقد الصحيح من غيره في المعاملات والحلال من الحرام من المأكولات والمشروبات لقوله عليه الصلاة والسلام. (**شرح الوقاية**)

কুরআন, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের কিতাবে যে ইলমের কথা বলা হয়েছে, যে ইলমের ফযীলত, বিধান ও অপরিহার্যতা তুলে ধরা হয়েছে, দারুল উলূম দেওবন্দ সে ইলমের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সে ইলমই শিক্ষা দিয়ে চলেছে।

এরই নাম দারুল উলূম। এরই নাম দারুল উলূম দেওবন্দ। এরই নাম ইলমের আঙ্গিনা। এরই নাম বিদ্যানিকেতন। এরই নাম ফরয ইলমে ওহির স্বচ্ছ সরোবর। এ আঙ্গিনার কাজ ইলমের ফরয দায়িত্ব পালন করা। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এ আঙ্গিনা অপরিহার্য।

এ ইলমকে যে ঐচ্ছিক মনে করবে, হীন মনে করবে, গায়রে জরুরী মনে করবে, পশ্চাদপদ মনে করবে সে মুসলমান থাকার কোন সুযোগ নেই। দারুল উলূমের 'উলূম' শব্দটি এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলমানের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ইলমের যিম্মাদার এ মাদরাসা বা দারুল উলূমসমূহ। সর্বযুগের দারুল উলূমগুলো এবং সবশেষে দারুল উলূম

দেওবন্দও এ কথাই জানে, এ বিশ্বাসই লালন করে। ঈমানের সাতাত্তর শাখার প্রত্যেকটি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব এ সকল দারুল উলূমের।

এতিমখানা কী?

এতিমখানা হচ্ছে, যেখানে এতিমদেরকে লালন করা হয়। এতিম যদি সচ্ছল হয় তাহলে তার জন্য তার অর্থকড়ি খরচ করার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা একটি শরয়ী দায়িত্ব। যেন একটি মানব শিশু, একটি মুসলিম শিশু অভিভাবকের অভাবে জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে না ফেলে। আর যদি শিশুটি সচ্ছল না হয় তাহলে তার থাকা, খাওয়া, পোশাক তথা জীবন ধারণের অপরিহার্য উপকরণগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ যা, 'আসাবা বি নাফসিহী' তথা ভাই ও চাচা থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে খলিফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীন পর্যন্ত গড়ায়।

এতিম লালন পালনের স্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এর ব্যষ্টিক কোন পদ্ধতি নেই। কারণ শরীয়ত প্রত্যেক এতিমের জন্য তার রক্তের সম্পর্কের ওয়ারিসদের মধ্য থেকে অভিভাবক নির্ধারণ করে দিয়েছে। শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অভিভাবকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এতিমের অনেক মাসআলার সম্পর্ক। যামানার ওযর দিয়ে, সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে যে দায়িত্বগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অভিভাবকের সর্বশেষ সিড়িতে রয়েছে খলিফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীন বা তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত প্রতিনিধি। এতিমের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব খলিফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মুমিনীনের উপর আসার আগ পর্যন্ত প্রতিটি পর্বই হচ্ছে ব্যক্তিগত। এর মাঝে সামষ্টিক রূপের কোন সম্ভাবনা নেই। এতিমের জামাত তৈরি করার কোন পদ্ধতি নেই। এতিমের ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কোন শিরোনামের কোন অস্তিত্ব নেই এবং প্রয়োজনও নেই।

আর এ দায়িত্ব যখন খলিফাতুল মুসলিমীনের হাতে আসে তখন এর সামষ্টিক ও জামাতবদ্ধ একটি রূপের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কারণ একজন খলিফাতুল মুসলিমীনের আওতাধীন বিশাল মুসলিম বিশ্বের বহু এতিমের দায়িত্বই তাঁকে নিতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এতিমদের পরিচর্যা পরিচালনার সুবিধার্থে জামাতবদ্ধ কোন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা যায় না এবং এর সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাস বলে, এতিমদের জামাতবদ্ধ কোন রূপ ছিল না এবং এতিমখানা পদ্ধতির কোন অস্তিত্ব ছিল না। কেন ছিল না এর সঠিক কোন কারণ হয়তো আমরা বলতে পারব না। তবে একটা সম্ভাবনার কথা বলা যায় যে, খলিফাতুল মুসলিমীনের হাতে যেসব এতিমের লালন পালনের দায়িত্ব পড়ত সেসব এতিমকেও খলিফাতুল মুসলিমীন ব্যক্তির দায়িত্বে দিয়ে দিতেন এবং এ বাবদ খরচা দেওয়ার প্রয়োজন হলে খলিফাতুল মুসলিমীন খরচা বহন করতেন।

এতিম শরীয়তের পরিভাষায় এতিম থাকা অবস্থায় অনুভব করতে পারত না যে, সে একজন এতিম। তারা ভিন্ন প্রজাতির কিছু মানুষ। সাধারণ মানুষের পরিচয় ভিন্ন, আর তাদের পরিচয় ভিন্ন। পৃথিবীর মানুষ হচ্ছে আশ্রয়দাতা, আর তারা হচ্ছে আশ্রিত। পৃথিবীর সকল মানুষ হচ্ছে করুণার আধার, আর তারা হচ্ছে করুণার পাত্র।

শরীয়ত যেমনিভাবে ভিক্ষুক নামের কোন কাফেলাকে স্বীকৃতি দেয় না, তেমনিভাবে এতিম নামে জামাতবদ্ধ কোন কাফেলাকেও স্বীকার করে না। এর সামষ্টিক কোন রূপ নেই। ভুল বোঝা বা ভুল বোঝানোর চেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই। ভিক্ষা ছিল, ভিক্ষুক ছিল। কুরআনে হাদীসে فقير ও فقراء ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে এতিম ছিল, এতিমের অভিভাবকত্ব ছিল। কুরআনে হাদীসে يتيم ও أيتام ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

এখানে বলা হচ্ছে, এগুলোর আলাদা কোন সামষ্টিক রূপ ছিল না। জামাতবদ্ধ কোন পদ্ধতি ছিল না। ফকীরখানা ও এতিমখানা নামে আলাদা কোন আয়োজন ছিল না। খলিফাতুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকেও ছিল না, দানবীরদের পক্ষ থেকেও ছিল না। যেমনিভাবে বৃদ্ধদের সেবা-যত্নের সকল আয়োজন ছিল, ফযীলত ছিল, বিধান ছিল, কিন্তু বৃদ্ধাশ্রম ছিল না।

এসবই হয়েছে মূলত মূল দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। শরীয়তের বিধানগুলো না মানার বিভিন্ন অযুহাত হিসাবেই এসকল উপসর্গের আবির্ভাব ঘটেছে।

যখন দ্বীন ও শরীয়তের তত্ত্বাবধান ছিল তখন শরীয়তের বাতলানো পদ্ধতিতেই এতিম, অসহায়, ভিক্ষুক ও বৃদ্ধদের সকল অধিকার আদায় হয়েছে। যার ফলে এতিমখানা, ভিক্ষুক নিবাস বা বৃদ্ধাশ্রম নামের কোন কিছুর অস্তিত্ব ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

এছাড়া এতিম হওয়া কোন অপরাধ নয় যে, তারা আজীবন এতিম নাম ধারণ করেই থাকতে হবে। তাদের পরিচয়ের জন্য আর কোন বিশেষণ থাকবে না।

লিল্লাহবোর্ডিং কী?

লিল্লাহবোর্ডিং হচ্ছে সরাইখানা। অথবা ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র। দুঃস্থ, ছিন্নমূল, নদীভাঙ্গা, বন্যাকবলিত, রিফুজি, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড় ও মঙ্গা কবলিত অসহায়দের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র। আল্লাহর ওয়াস্তে অসহায় মানুষদেরকে অন্নদানকেন্দ্র।

ভিনদেশী মুসাফির, বাইতুল্লাহর মুসাফির, যে কোন পবিত্র ভূমিতে আগত তীর্থযাত্রী ইত্যাদি প্রকারের মানুষদের জন্য ছিল লিল্লাহ খাদ্যের ব্যবস্থা। বিশেষত যে যামানার সফর ছিল পায়ে হেঁটে, গাধা-ঘোড়া ও উটের পিঠে চড়ে, সফরগুলো ছিল সপ্তাহব্যাপী, মাসব্যাপী তখন পথের বিভিন্ন মনযিলে মনযিলে সরাইখানা ও লিল্লাহবোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হত। খলিফাতুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকেও করা হত, ব্যক্তি উদ্যোগেও করা হত।

এখানে নিম্নোক্ত আয়াতটির প্রতিপাদ্য বিষয়ও আমাদের মনে থাকতে পারে-

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.﴾ (سورة التوبة:٦٠)

এ আয়াতে লিল্লাহ ব্যবস্থা যাদের জন্য রাখা হয়েছে তারা কারা? এবং তাদের শিরোনাম কী? কেউ কেউ হয়তো এখানে আসহাবে সুফ্ফাকে টেনে আনার চেষ্টা করতে পারেন।

আসহাবে সুফ্ফা

এ বিষয়ে আমাদের নিবেদন হচ্ছে, আসহাবে সুফ্‌ফা থেকে নমুনা গ্রহণ করে আমরা লিল্লাহবোর্ডিং চালু করিনি -এটাই সত্য কথা। তর্কে জেতার জন্য কেউ এমন চেষ্টা করবেন তাতে আশ্চর্যবোধ করার কিছু নেই।

কিন্তু বাস্তবেই যদি কেউ দলিল হিসাবে আসহাবে সুফ্‌ফাকে পেশ করার মানসিকতা পোষণ করে থাকেন, তাহলে প্রথমে আমরা অনুরোধ করব এ পিচ্ছিল পথে পা বাড়াবেন না। আমরা আমাদের একটি হীন কর্মকাণ্ডকে প্রমাণ করার জন্য আসহাবে সুফ্‌ফার নমুনা টেনে আনা একটি অপচেষ্টারই বহিঃপ্রকাশ। এ শিরোনামে তর্কে জড়াতে মন একদম সায় দিচ্ছে না।

কিন্তু এরপরও যদি কেউ এমন হীন কাজটিও করে ফেলেন তখন এর দ্বারা কিছু মানুষ ধোঁকা খাবে -এটাই স্বাভাবিক। সে আশঙ্কা থেকেই মূলত সীরাত থেকে এবং ইসলামের ইতিহাস থেকে আসহাবে সুফ্‌ফার পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে। পাঠক আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন। পার্থক্যগুলো ধরতে পারবেন। আমরা আমাদের একেবারে সাময়িক স্বার্থ ও সুবিধাগুলোকে কুরবান করার একটু সৎ সাহস দেখালেই আশা করি বিষয়গুলো আরো সহজ হয়ে যাবে।

وبجانب أولئك جماعة سادسة يبلغ عددها سبعين صحابيًّا من أصحاب الصُّفَّة؛ الَّذِين لم يكن لهم بيت يأوون إليه إلَّا فناء المسجد، ولم يكن لهم من مَتاع الدنيا إلَّا ما على أجسادهم من أسمال بالية؛ فكانوا يخرجون إلى الصحراء يحتطبون منها، ويبيعون ما يجمعونه في السُّوق، ويقتاتون بثَمَنه، وإذا بقي في يدهم شيء أنفقوه في سبيل الله، وفَرَغُوا للدِّين، وانقطعوا لتعلُّم أحكامه وعبادة ربهم.(**من الرسالة المحمدية لسليمان الندوي الحسيني ١/١٣٧)**

روى البيهقي عن عثمان بن اليمان قال: «لما كثر المهاجرون بالمدينة ولم يكن لهم زاد ولا مأوى، أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وسماهم أصحاب الصفة؛ وكان يجالسهم ويأنس بهم، أي وكان إذا صلى أتاهم فوقف عليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فقراً وحاجة».(**من السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي، ٢/١١٢)**

أهل الصفة: قال أبو هريرة: «وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد» إن المهاجرين الأوائل الذين هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو معه أو بعده حتى نهاية الفترة الأولى قبل غزوة بدر، استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بيوتهم وأن يشاركوهم النفقة ولكن فيما بعد كبر حجم المهاجرين مما لم يعد هناك قدرة للأنصار على استيعابهم.

فقد صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيء، فإن الإسلام صار ينتشر والناس يدخلون فيه.. ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء والأغنياء، والآهلين والعُزَّاب، فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه، يأوي إلى تلك الصُّفة في المسجد.

والذي يظهر للباحث أن المهاجر الذي يقدم إلى المدينة كان يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يوجهه بعد ذلك إلى من يكفله فإن لم يجد فإنه يستقر في الصفة مؤقتاً ريثما يجد السبيل. فقد جاء في المسند عن عبادة بن الصامت، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً، وكان معي في البيت أُعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن» وقد كان أول من نزل الصفة المهاجرون، لذلك نسبت إليهم فقيل صفة المهاجرين، وكذلك كان ينزل بها الغرباء من الوفود التي كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم معلنة إسلامها وطاعتها، وكان الرجل إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له عريف نزل عليه وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه عريف من سكن الصفة من القاطنين، ومن نزلها من الطارقين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دعوتهم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفته بهم، وبمنازلهم ومراتبهم في العبادة

والمجاهدة، ونزل بعض الأنصار في الصفة حباً لحياة الزهد والمجاهدة والفقر، رغم استغنائهم عن ذلك ووجود دار لهم في المدينة ككعب بن مالك الأنصاري، وحنظلة بن أبي عامر الأنصاري (غسيل الملائكة) وحارثة بن النعمان الأنصاري وغيرهم.

نفقة أهل الصفة ورعاية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهم:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أهل الصفة بنفسه، فيزورهم ويتفقد أحوالهم ويعود مرضاهم، كما كان يكثر مجالستهم ويرشدهم ويواسيهم ويذكرهم ويعلمهم ويوجههم إلى قراءة القرآن الكريم ومدارسته، وذكر الله والتطلع إلى الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يؤمن نفقتهم بوسائل متعددة ومتنوعة فمنها:

إذ أتته صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها، وأشركهم فيها.

كثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحدى حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ولم يكن يغفل عنهم مطلقاً، بل كانت حالتهم ماثلة أمامه، فعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، قال إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس» أو كما قال، وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. (**السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث لعلي محمد محمد الصلابي، المبحث الأول: الدعامة الأولى بناء المسجد ٣/١٢٢**)

وأما أصحاب الصفة فقوم فقراء لا منزل لهم غير المسجد. روينا عن ابن سعد قال: أنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن نعيم المجمر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: رأيت ثلاثين رجلا من أهل الصفة يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه

وسلم ليس عليهم أردية. عد منهم أبو هريرة وأبو ذر وواثلة بن الأسقع وقيس بن طخفة الغفاري. وقد ذكر في عددهم أكثر من ذلك بكثير. (**عيون الأثر في فنون المغازي والسير، الناشر: دار القلم – بيروت: ٣٨٥/٢**)

নিবেদন হচ্ছে, আসহাবে সুফ্‌ফার পরিচয় এবং অবকাঠামো থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা হতে পারে যে, লিল্লাহবোর্ডিং একটি মাদরাসার শিরোনাম হতে পারে। কারণ, আসহাবে সুফ্‌ফার সদস্যগণ ইলম শিখছিলেন এবং তাদের জন্য লিল্লাহবোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কিন্তু ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তা হচ্ছে:

এক. সুফ্‌ফার আয়োজন ফরয ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। তা করা হয়েছে মুহাজিরগণের জন্য, যারা ছিন্নমূল হয়ে নিজের সহায় সম্বল সব হারিয়ে এসে মদীনায় পৌঁছেছেন। আর এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের মূল ব্যবহার ক্ষেত্র আসলে এটাই।

দুই. তাদের শিরোনাম ছিল 'আসহাবুস সুফ্‌ফা'। 'দারুল আইতাম' বা 'দারুল মাসাকীন' শিরোনামের তো প্রশ্নই আসে না -এবং আমরা তা আশাও করি না-; এর কাছাকাছি অর্থবোধক কোন শব্দ বা পরিভাষাও সেখানে ব্যবহার করা হয়নি। আর ইতিহাস এ কথা বলে যে, মুহাজিরগণের এ ছিন্নমূল অবস্থা কেটে যাওয়ার পর শুধু দ্বীন শিক্ষার জন্য এ ব্যবস্তা বলবৎ থাকেনি।

তিন. সীরাতের কিতাবে আসহাবে সুফ্‌ফার পরিচয়ের মাঝে এ কথাও উঠে এসেছে যে, তাঁরা রিযিকের অন্বেষণে কাজ করতেন। কাঠ কাটতেন, ক্ষেতে কাজ করতেন, বাজারে গিয়ে ছোটখাট ব্যবসা করার চেষ্টা করতেন। যা বর্তমান প্রচলিত 'লিল্লাহবোর্ডিং' এর স্বভাবের সঙ্গে শতভাগ সাংঘর্ষিক।

চার. সুফ্‌ফার সদস্যদের সুফ্‌ফা থেকে ছুটি পাওয়ার মাপকাঠি ছিল, তাঁদের আবাসন ও কামাই রোযগারের ব্যবস্থা হওয়া। দ্বীন শিক্ষা শেষ হওয়া এর মাপকাঠি ছিল না।

পাঁচ. সুফ্‌ফার সদস্যগণ কখনো নিজের জন্য বা অপরের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে সামর্থ্যবানদের কাছে যেতেন না।

ছয়. সুফ্‌ফার সদস্যগণের গায়ে জড়ানো সম্বলের বাইরে আর কিছু ছিল না। রিক্তহস্ত মানে রিক্তহস্তই।

সাত. সুফ্ফার সদস্যগণের নিজস্ব কোন ঠিকানা ছিল না।
আট. সুফ্ফার সদস্যগণের মধ্যে কেউ এতিম ছিলেন না।

মাদরাসা কী?

মাদরাসা হচ্ছে বিদ্যালয়। যে কোন বিদ্যানিকেতনকেই মাদরাসা বলা হয়। চাই তা ইসলাম শিক্ষার জন্য হোক বা পার্থিব উপায়-উপকরণ শিক্ষার জন্য হোক। মাদরাসা শব্দটি আরবী হওয়ার কারণে বাংলাভাষীদের কাছে শব্দটি ইসলাম শিক্ষার কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এর বিপরীত পার্থিব শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় বা স্কুল শব্দ ব্যবহার করা হয়।

পার্থিব উপায় উপকরণের শিক্ষা হোক বা ইসলাম শিক্ষা হোক সর্বাবস্থায় মাদরাসা হচ্ছে একটি শিক্ষালয়। কোন অবস্থাতেই এটা কোন সরাইখানা নয়। এটা কোন লঙ্গরখানা নয়। এটা কোন অনাথ আশ্রম নয়। এটা কোন ছিন্নমূল পুনর্বাসন কেন্দ্র নয়। এটা হচ্ছে জ্ঞানের সরোবর।

এখানে বিশ্বের সেরা ধনী এবং তার সন্তানও আসতে হবে, এবং বিশ্বের এক নম্বর গরীব ও তার সন্তানও আসতে হবে। শ্বেতাঙ্গও আসতে হবে কৃষ্ণাঙ্গও আসতে হবে। বীর বাহাদুরও আসতে হবে দুর্বল চিলেকাঠও আসতে হবে। ভরাপেটও আসতে হবে ক্ষুধার্ত ক্লিষ্টও আসতে হবে। বিশেষত যখন এ মাদরাসা হবে 'দারুল উলূম'।

দেখুন, লঙ্গরখানা, অনাথ আশ্রম বা ছিন্নমূল পুনর্বাসন কেন্দ্র এগুলোও ইসলামের পক্ষ থেকে অর্পিত একেকটি দায়িত্ব এবং অবস্থাভেদে ফরয-ওয়াজিব দায়িত্ব। এর অস্তিত্ব শুধু স্বীকার করলেই চলবে না, সে দায়িত্ব আদায়ও করতে হবে। কিন্তু এগুলো সর্বাবস্থায় মাদরাসা নয়। দারুল উলূম হওয়ারতো প্রশ্নই আসে না।

দারুল উলূম কেন?

কারণ দু'পায়ের এ সবাক প্রাণীটি নিজেকে মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে চাইলে অবশ্যই তাকে দারুল উলূমে আসতে হবে। ইলমের আঙ্গিনায় আসতে হবে। কারণ এ আঙ্গিনাই তাকে পশুত্বের গণ্ডি থেকে বের করে এনে মানুষের কাতারে দাঁড়ানোর যোগ্য করবে। ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ নিজেকে মানুষ হিসাবে পরিচয় দেওয়ার অধিকার রাখে না। সে ঈমানের সাতাত্তর শাখার প্রতিটি শাখা তাকে দারুল উলূমে এসেই শিখতে হবে। নচেৎ তার পরিচয় তাই হবে যা আল্লাহ তাআলা তাঁর কুরআনে দিয়েছেন-

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ✫ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُو ✫ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ✫ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ✫ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا **أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ** أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ **(سورة الأعراف: ١٧٥–١٧٩)**

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ✫ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ **إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا**﴾ (سورة الفرقان: ٤١–٤٤)

কেউ বুশ-ব্লেয়ার-ট্রাম্প, প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট, নিউটন-কলম্বাস, আব্রাহাম লিংকন-রুশো-ভোল্টায়ার হতে পারবে। কিন্তু সে চতুষ্পদ জন্তুর কাতার থেকে উঠে এসে মানুষের কাতারে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই তাকে মাদরাসা ও মাদরাসা ওয়ালার কাছে ধর্ণা দিতে হবে।

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ে তাদের কোন কাজ নেই -এ কথা ঠিক আছে। কিন্তু দারুল উলূম থেকে বিমুখ হয়ে তার কোন নিস্তার নেই।

সে রাজা হবে। কিন্তু বনের রাজা সিংহওতো রাজা। কিন্তু সেতো আর মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। পিঁপড়ার রাজাও রাজা, কচ্ছপের রাজাও রাজা, মৌমাছির রাণীও রাণী। কিন্তু এ রাজা হয়েতো আর মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের আলোচনা চলছে মানুষ হওয়া নিয়ে।

তাই আজ এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং আর মাদরাসা-দারুল উলূমের পার্থক্য রেখা স্পষ্ট হওয়া সময়ের অনিবার্য দাবি। যত কষ্টই হোক! যত ত্যাগই এর জন্য দিতে হোক!

দ্বীনের ফরয ইলমের ঠিকানা

এ দারুল উলূম হচ্ছে দ্বীনের ফরয ইলমের ঠিকানা। সহীহ বুখারীর-

باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

থেকে শুরু করে-

باب قول الله تعالى {ونضع الموازين القسط}. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن

পর্যন্ত পুরোটাই এ ইলমের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রতিটি অধ্যায়ই দারুল উলূম তথা ইলমের আঙ্গিনার বিষয়বস্তু। ঈমানের সাতাত্তর শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা 'তাওহীদের কালিমা' থেকে শুরু করে 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া' পর্যন্ত প্রতিটি শাখাই ইলমের এ অঙ্গিনাগুলোর আলোচ্য বিষয়।

একজন বাদশাহ মানুষ হওয়ার জন্য ঠিকানা হচ্ছে দারুল উলূম। একজন আমীর মানুষ হওয়ার জন্য ঠিকানা হচ্ছে দারুল উলূম। বিশ্বসেরা ধনী মানুষ হওয়ার জন্য ঠিকানা হচ্ছে দারুল উলূম। বিশ্বের সকল অমানুষ মানুষ হওয়ার শেষ ঠিকানা হচ্ছে দারুল উলূম।

কারণ ইলম ও উলূম মানেই হচ্ছে ইলমে ওহি। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত কর্তৃক প্রদত্ত ইলম। আর এ ইলমের ঠিকানাই হচ্ছে, দারুল উলূম। এছাড়া যত বিদ্যালয় বিদ্যানিকেতন রয়েছে সেসবের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সকাল-সন্ধ্যার খৈল-ভুষি জোগাড় করা। হয়তো কারোটার মান একটু উঁচু, আর কারোটার মান একটু নিচু।

মানবসৃষ্টির রহস্য এবং মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের কিছু জানাও নেই এবং অজ্ঞতাবশত তাদের এ বিষয়ে জানার কোন আগ্রহও নেই। উদ্দেশ্যহীন জীবন, আর লক্ষ্যহীন পথ চলা।

কিন্তু দারুল উলূমতো এমন উদ্দেশ্যহীন কিছু নয়। এ হচ্ছে, মানবসৃষ্টির রহস্য, মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানবজীবন পরিচলানার স্রষ্টাকর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র জানার একমাত্র বিদ্যাপীঠ। এ হচ্ছে এক অনিবার্য ফরয দায়িত্ব।

কিন্তু এ ফরয দায়িত্বের ঠিকানাকেই আজ আমরা লঙ্গরখানা ও অনাথ আশ্রম হিসাবে পরিচয় দিতে খুব আরামবোধ করছি।

احساس عنایت کر آثار مصیبت کا وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرماں دے*

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ আসলে অবশ হয়ে গেছে। আর আমরা মনে করছি, আমাদের ধৈর্য ক্ষমতা বেড়েছে। সহনশীলতা বেড়েছে। ইলমের

ওজন বেড়েছে। শরীরের ওজনকে আমরা ইলমের ওজন মনে করে বসে আছি। চাটুকারদের স্বার্থের করতালিকে আমরা জিবরীলের ঐশী ভালোবাসা মনে করে বসে আছি। হাঁস-মুরগি আর মৎস প্রকল্পের মাছের জীবনকে আমরা জান্নাতী জীবন ভেবে দিন-সপ্তাহ-মাস-বছর-যুগ এমনকি জীবনের পর জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু আমাদের ধোঁকা খাওয়ার এ মেয়াদ আর কত দীর্ঘ হওয়া উচিত?

এতিমখানার আসল অর্থ কি এখন বিলুপ্ত?

অনেকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, আবার অনেকে নিজে নিজেই বোঝার চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ এ কথা বলে মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে, এতিমখানার সে আদি ও আসল অর্থ এখন মানুষের মাথায় নেই। এতিমখানা বললে মানুষ বুঝে নেয় দ্বীনী মাদরাসা।

যেমনিভাবে মানুষ মাদরাসা শব্দের আসল অর্থ জানুক আর না জানুক এ শব্দ শুনলে বুঝে নেয় যে, এখানে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। তেমনিভাবে এতিমখানা শুনলে বুঝে নেয়, এটি একটি ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। মানুষ এ শব্দের না শাব্দিক বিশ্লেষণ জানে, আর না এর শরয়ী পরিভাষা সম্পর্কে অবগত আছে। ব্যস, এতিমখানা মানে মাদরাসা এবং দ্বীনী মাদরাসা।

এ বিষয়ে আমার প্রথম ও সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন হচ্ছে, এটি একটি আত্মপ্রবঞ্চণা ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বলব, এতিমখানার আসল অর্থ বিলুপ্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ:

এক. দারুল উলূম তথা ইলমের আঙ্গিনাকে এতিমখানা শিরোনামে ব্যবহার করা শুরুই হয়েছে এতিমখানার আসল অর্থকে পুঁজি করে। আসল অর্থের স্পর্শকাতরতাকে মূল উপাদান বানিয়ে এ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত করার কোন সুযোগ নেই।

দুই. এতিমখানাকে ইলমের আঙ্গিনার শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করার পর এর প্রচার প্রসার হয়েছে অসম্ভব রকমের ব্যাপক পরিসরে। এতিমখানার জন্য গান বানানো হয়েছে। এতিমখানার শিক্ষার্থীরা অসহায় এতিম -এ কথা

সাধারণ জনগণের সামনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য অসংখ্য রকমের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

তিন. যে দিন থেকে ইলমের অঙ্গন এতিমখানার শিরোনাম ধারণ করেছে, সে দিন থেকে আজো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাগজে-পত্রে, নথিতে-প্রচারপত্রে এতিমী ও অসহায়ত্বের কথা এতো ফলাও করে তুলে ধরার ধারাবাহিকতা চলছে যার মাঝে কোন ছেদ নেই, ছন্দের কোন পতন নেই।

চার. এতিমখানা বাস্তবে এতিমখানা নয় -এ কথা বলার প্রতি কারো কখনো আগ্রহ দেখা যায় না। এরই বিপরীত মাদরাসা একটি এতিমখানা -এ কথা বলার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অস্বাভাবিক আগ্রহ লক্ষ করা যায়।

পাঁচ. এতিমখানা নামের মাদরাসাগুলোকে এতিমখানা হিসাবে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধতো নেইই; বরং ক্ষেত্রবিশেষ অসত্যের আশ্রয় নেয়াকেও জরুরী এবং ফযীলতপূর্ণ মনে করা হয়।

ছয়. এতিমখানা নামের মাদরাসাগুলোকে এতিমখানা হিসাবে বলা ও লেখার ক্ষেত্রে কোন প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় -এমন কোন উদাহরণ কেউ দেখাতে পারবে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষ এমনও দেখা গেছে এবং দেখা যায় যে, মাদরাসা শব্দটি নেই, মাদরাসার নাম নেই, বড় অক্ষরে শুধু লেখা আছে 'এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিং'।

এমতাবস্থায় এ আত্মপ্রবঞ্চণার কী বৈধতা আছে যে, এতিমখানা বললে বা লিখলে মানুষ মাদরাসাই বোঝে, এর শাব্দিক বা পারিভাষিক অর্থ বোঝে না, তাই কোন সমস্যা নেই।

লিল্লাহবোর্ডিং -এর আসল অর্থ কি বিলুপ্ত?

আমরা কেন এ ধারণা করে বসে আছি যে, লিল্লাহবোর্ডিং বললে মানুষ লঙ্গরখানা বোঝে না। অথচ লিল্লাহবোর্ডিং মানে যে লঙ্গরখানা তা বোঝানোর জন্য আমরা সকল আয়োজন করে রেখেছি। আর সে অবস্থায়ই শব্দটি ফরয ইলমের আঙ্গিনা মাদরাসা ও দারুল উলূমের সমাদৃত (?) শিরোনাম হয়েছে! ওয়া ইন্না লিল্লাহ!

লিল্লাহবোর্ডিং ও ইলমের আঙ্গিনা একই বিষয়, সমার্থবোধক পরিভাষা -এ কথা বোঝানোর জন্য যেসব ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে তার কিছু হয়তো এমন হতে পারে যা আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। যেগুলো সচেতন মহলের আওতাধীন নয়। যার ফলে ইচ্ছা করলেও তা থেকে আর

ফিরানো যাচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে পদ্ধতিগুলো থেকে ফিরে আসা আমাদের জন্য সম্ভব সেগুলো থেকেও ফিরে আসার কোন ভাব-গতি আমাদের মাঝে দেখা যাচ্ছে কি না?

যদি না থাকে তাহলে এ কথা দাবি করা যেতেই পারে যে, যে পদ্ধতিগুলোকে আমরা আমাদের নাগালের বাইরে বলছি সেগুলোকেও আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। যদিও তর্কের খাতিরে কখনো কখনো এগুলোকে ভুল বলে স্বীকার করে নেই।

এখানে আমি কিছু নমুনা তুলে ধরছি। যার কিছুকে আমরা ভুল বলে স্বীকার করি, কিন্তু তা থেকে ফিরে আসার কোন লক্ষণ ও সদিচ্ছা দেখা যায় না। অথবা বলা যায়, এসবের যেগুলোকে আমরা ভুল বলে স্বীকার করি তার অধিকাংশই জন্ম নিয়েছে সেসব পদ্ধতি থেকে যেগুলোকে আমরা ভুল মনে করি না।

আর কিছু আছে এমন যেগুলোকে আমরা আজো পর্যন্ত ভুল বলে স্বীকার করতে চাচ্ছি না। অথচ তা সঠিক হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি বা দলিল নেই। নমুনাগুলো নিম্নরূপঃ

এক. যানবাহনে লিল্লাহবোর্ডিং -এর নামে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা উত্তোলন

যানবাহনে যারা লিল্লাহবোর্ডিং -এর নামে যাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা তোলে তাদের অবস্থা আমাদের সবার সামনে স্পষ্ট। প্রতিদিন আমরা তা দেখে চলেছি। কেউতো এ কাজ করছে, কেউ করাচ্ছেন, কেউ আগ্রহের সঙ্গে তাদের দান খয়রাত করে চলেছেন। আর কেউ এর কিছু সমস্যাকে স্বীকার করলেও এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন মনে করেন না। সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে, এর মাঝে নিহীত সমস্যাগুলো অনেকেই উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন না।

এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমার দৃষ্টিতে অনেক বড় ধরনের সমস্য বলে মনে হয়েছে সেগুলো নিয়ে পাঠকের সঙ্গে একটু মতবিনিময় করতে চাই।

তথ্যবিহীন চাঁদার প্রসার

ক. যানবাহনে টাকা উত্তোলনকারী ব্যক্তি যাত্রীদের কাছ থেকে যে টাকাগুলো নিয়ে থাকে তার কোন ডকুমেন্ট বা রসিদ তাদেরকে দেয় না। প্রদর্শন করার জন্য একটি পুরাতন রশিদ বই তাদের হাতে থাকে। কিন্তু তা থাকে শুধুমাত্র দেখানোর জন্য। টাকা আদান প্রদানের সঙ্গে ঐ রশিদ বইয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

লিল্লাহবোর্ডিং ও এতিমখানা শিরোনাম ধারণ করতে যারা পছন্দ করেন এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রস্তুত একটি জবাব হচ্ছে, এরা আসলে কোন এতিমখানা লিল্লাহবোর্ডিংয়ের পক্ষ থেকে এসব কাজ করে না, এটা তাদের ব্যবসা, এটা তাদের ধোঁকা। নিজে টাকা কামানোর জন্য একটা ফন্দি এঁটেছে। এতিমখানা লিল্লাহবোর্ডিংয়ের নাম বিক্রয় করে খায়।

এ জবাবটি সঠিক হওয়ার পেছনে অনেকগুলো যৌক্তিক কারণ রয়েছে এবং এর বাস্তবতাও রয়েছে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ জবাবটিকে আমরা যথেষ্ট মনে করতে পারছি না। কারণ,

প্রথমত: এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের আয়ের জন্য যেসব পদ্ধতি রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এ পদ্ধতির বড় ধরনের কোন ব্যবধান নেই।

দ্বিতীয়তঃ আমার সুনির্দিষ্টভাবে এমন মাদরাসার কথা জানা আছে যারা এ পদ্ধতিতে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য টাকা উত্তোলন করেন।

তৃতীয়তঃ এই চাঁদাবাজরা সংশ্লিষ্ট এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের পরিচয়পত্র গলায় ধারন করে কাজটি করেন। যা এ কথা প্রমাণ করে যে, লোকটি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের অনুমতিক্রমেই এ কাজ করে।

চতুর্থতঃ এসব চাঁদাবাজরা যেসব এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের নাম বলে থাকে সেসব এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং সাধারণত কাছাকাছি ঠিকানার হয়ে থাকে। যানবাহনের যাত্রীরা হয়তো তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারবে না, কিন্তু এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গও তাকে চিনতে পারবে না, তার ধোঁকাবাজি ধরতে পারবে না এ কথা মানা যায় না। আর ধরতে পারলেও তাকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের নাম বিক্রয় করে খাওয়া থেকে বাধা দিতে পারবে না এ কথাও মেনে নেয়া যায় না।

তাই আমাদের সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে না যে, এসকল চাঁদাবাজদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই।

ধর্ম প্রচারের এ কী হালত?

খ. এ সকল চাঁদাবাজ মানুষের কাছ থেকে টাকা নেয়ার আগে আখেরাতের বয়ান করে থাকে। ইসলাম, কবর, হাশর, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের ফযীলত, দান খয়রাতের ফযীলত ইত্যাদি বয়ান করে পরে কোন রকমের ডকুমেন্ট ছাড়া মানুষের কাছ থেকে এক টাকা দুই টাকা করে নিয়ে যায়।

প্রায়ই দেখা যায়, একজন প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক যে পরিমাণ টাকা পায় সেও সে পরিমাণ বা তার চাইতে কম পায়। এমনিভাবে একজন ভিক্ষুকের সঙ্গে যাত্রী ও যানবাহন কর্তৃপক্ষ যে আচরণ করে থাকে তার সঙ্গে সে পরিমাণ বা তার চাইতে নিম্ন পর্যায়ের আচরণ করে থাকে। কিছু দৃশ্য অনেক বেশি আপত্তিকর হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে আমার মূল্যায়ন হচ্ছে, একজন মানুষ তার ব্যক্তি স্বার্থের জন্য এবং একটি গর্হিত কাজ করতে গিয়ে দ্বীন, ইসলাম, ইলম, মাদরাসা, কুরআন, হাদীস, ওলামা, তালাবা ও দ্বীনদারদেরকে যেভাবে হেয়প্রতিপন্ন করল, নিন্দিত আকৃতিতে মানুষের সামনে তুলে ধরল -এ অপরাধের বড়

একটি অংশ কি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ধারণ করতে যারা পছন্দ করেন তাদের উপর আসবে না?

জাল ও মিথ্যার পসরা

গ. এ চাঁদাবাজরা অনেক মিথ্যা কাহিনী ও জাল কথা শুনিয়ে থাকে। মানুষের পকেট থেকে টাকা বের করার জন্য যে কথাগুলোকে হাদীস বা কুরআন বলা দরকার সে কথাগুলোকে হাদীসে-কুরআনে আছে বলে চালিয়ে দেয়। যে কাহিনী বানানো দরকার সে কাহিনী তারা তৎক্ষণাৎ বানিয়ে ফেলে। যাত্রীদের অনেকেই সে কথাগুলো যে মিথ্যা তা বুঝতে পারে।

তাদের মিথ্যাগুলোকে মিথ্যা হিসাবে চেনার পর যাত্রীদের অনেকে এ কথা বুঝে নেয় যে, এসবের পেছনে এতিমখান-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষের সমর্থন ও যোগান রয়েছে। এরপর একধাপ এগিয়ে তারা আরো বুঝে নেয় যে, দেশের মাদরসা, দারুল উলূম তথা দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এভাবেই চলছে। আরেক ধাপ এগিয়ে তারা ফলাফল বের করে আনে, এভাবে ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া তারা আর করবেই বা কী?

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের এ বুঝে নেয়ার মধ্যে কী কী ভুল রয়েছে? এবং সে ভুলের মধ্যে কতটুকুর জন্য আমরা দায়ী? আর কতটুকুর জন্য তারা দায়ী?

এমতাবস্থায় এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের শিরোনামে মাদরাসা, দারুল উলূম তথা ইলমের আঙ্গিনাগুলো মানুষের সামনে কীভাবে রূপায়িত হচ্ছে, ইলমের ধারক বাহকগণ কী পরিচয়ে মানুষের সামনে ভূষিত হচ্ছেন -তা নিয়ে চিন্তা করার কি কোন প্রয়োজন নেই?

বিকৃত তিলাওয়াত ও তরজমা

ঘ. এ চাঁদাবাজরা কুরআনকে বিকৃত করে তিলাওয়াত করে, হাদীসকে বিকৃত করে পড়ে থাকে। সাধারণ মানুষদের অনেকে তা বুঝতে পারে। কিন্তু চাঁদাবাজের বাহ্যিক অবয়ব এতটাই আলিশান হয় যে, দর্শকমাত্রই তাকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের যিম্মাদারদের একজন মনে করে বসে। সদরিয়া, শেরওয়ানী, রুমাল, পাগড়ী, তাসবীহ কোন দিকে তার কোন কমতি থাকে না।

এমতাবস্থায় সে যখন কুরআন হাদীসকে বিকৃত করে মানুষকে শোনাতে থাকে তখন মানুষ এ থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের একটি ছবি মনের

মধ্যে এঁকে নেয়। সে ছবিকে সে মাদরাসা, দারুল উলূমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ইলমের সরোবর ও হামেলে ইলমে ওহির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। আর ফলাফল বের করে আনে, মাদরাসার নামে এগুলোই চলছে।

আমি আগেও বলেছি, আবারও বলি, এগুলোর অনেকগুলোই এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ধারনকারীগণের নাগালের বাইরে। কিন্তু নাগালের বাইরে বলেই আমরা এর জবাব দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাব বিষয়টি এমন নয়। কারণ আমরা এর প্রথম আয়োজক ও প্রচারক।

শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বিরক্তির কারণ

ঙ. একজন ভিক্ষুক যেমন পারিপার্শ্বিক কোন কিছু বিবেচনা না করে নিজের ভিক্ষার থলি ভর্তি করার দিকে সর্বান্তকরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে এবং সে জন্য সে কখনো চিন্তা করার সুযোগ পায় না যে, যাত্রী বিরক্ত হল না খুশি হল, ভিড়ের মধ্যে যাত্রীদের কষ্ট হচ্ছে না শান্তি পাচ্ছে, তারা ঘুমাচ্ছে না সজাগ, তারা কথা শোনার জন্য প্রস্তুত না কি প্রস্তুত নয়।

মোটকথা যাত্রীর কী অবস্থা তা নিয়ে ভাবার মত সময় তার কাছে নেই। তার প্রয়োজন শুধুমাত্র কোন না কোনভাবে তার ভিক্ষার থলিতে দু'টি পয়সা জমা হোক। দ্বীন-ধর্ম নিয়ে তাদের কোন পেরেশানী নেই।

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের পক্ষ থেকে যারা চাঁদা করে তাদেরও ঠিক একই অবস্থা। তার চাঁদার থলিতে দু'টি টাকা পড়া দরকার। এর বিনিময়ে কে মাদরাসার উপর বিরক্ত হল, কে দারুল উলূমের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করল, কে ওলামায়ে কেরামের প্রতি খারাপ মন্তব্য ছুড়ে দিল, সর্বোপরি কার মাঝে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হল তা নিয়ে ভাবার মত সময় তার কাছে নেই। তার প্রয়োজনও নেই। এসবই এখন প্রতিদিনের সত্য।

দুই. রাস্তায় মাইক লাগিয়ে, লাল কাপড় টাঙ্গিয়ে, যাত্রীবাহী গাড়ি থামিয়ে লিল্লাহবোর্ডিং -এর জন্য টাকা উত্তোলন

এ পদ্ধতিটি কোন ধোঁকাবাজ চাঁদাবাজ গ্রহণ করেছে -এ কথা বলা যাবে না। কারণ, এমনটি করা হয় সরাসরি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের সামনে। সেখানে লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষকেও দেখা যায়, এলাকার কিছু বেকার যুবককেও দেখা যায়, আবার অল্প বয়সী কিছু কৌতূহলী শিশুকে

দেখা যায়। অতএব এ পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠানের সরাসরি তত্ত্ববধান ও নেগরানীতে পরিচালিত হয় বলে আমরা দাবি করতে পারি।

এ পদ্ধতিতে ধোঁকাবাজদের ধোঁকা থেকে তো আমরা বেঁচে গেলাম। কিন্তু আর কী কী হারালাম তাই আপনাদেরকে বলব বলে ইচ্ছা করেছি।

ক. যে কৌতূহলী শিশুরা এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে তাদের কেউ কেউ গাড়িতে উঠে যায় এবং যাত্রীদের কাছ থেকে নগদ টাকা গ্রহণ করে। এ পদ্ধতিতে ধোঁকার গন্ধ না থাকার কারণে যাত্রীরা একটু ভরসার সাথেই পকেট থেকে টাকা বের করে থাকে। শিশুটি উত্তোলিত টাকা নিয়ে যখন নামে তখন গাড়ি এক দুই কিলোমিটার পার হয়ে যায়।

আস্থাশীল মানুষদের মনে এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক ঘটে না। কিন্তু আমি একজন সন্দেহপ্রবণ মানুষ হওয়ার কারণে এখানেও দু'টি জায়গায় আমার খটকা লাগে-

প্রথমত: যে শিশুটিকে আমি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য টাকা দিলাম সে শিশুটি একটি শিশুই। সে যদি কর্তৃপক্ষের অগোচরে দু'চারটি টাকা হেরফের করে ফলে -এবং এমন হওয়াই স্বাভাবিক- তা হলে এর জন্য একটি শিশুকে দায়ী করা যায় না। কিন্তু খেয়ানতের যে পথে আমি তাকে অগ্রসর করে দিলাম এর জন্য আমার জবাব কী?

দ্বিতীয়ত: খেয়ানত যদি সে নাও করে, এরপরও মানুষের কাছে এক দুই টাকা করে চাওয়ার যে অনুশীলন তাকে করানো হচ্ছে সে তা ভুলবে কীভাবে? একটি কচি শিশুর শিক্ষা যদি শুরু হয় মানুষের কাছে হাত পাতা দিয়ে তা হলে সে শিশু কীভাবে তার এ হাতকে গুটিয়ে নেবে? সে যদি বুঝে থাকে যে হাত পাততে কোন অপরাধ নেই তাহলে তা থেকে সে নিজেকে বিরত রাখার চিন্তা করবে কেন?

আরো দুঃখজনক হচ্ছে, সে এসবই করবে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের শিরোনামে। যারফলে এ বিষয়ে তার কখনো অপরাধবোধ জাগবে না। আর সে ফিরেও আসতে পারবে না। কমপক্ষে এতটুকুতো নিশ্চিত।

নিজের সে দেখা ভুলতে পারছি না

আমার নিজের দেখা, ঢাকা-কুমিল্লা মহাসড়কের মাঝামাঝি কোথাও থেকে এভাবে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের সামনে থেকেই একটি শিশু গাড়িতে উঠে পড়েছে। মাইকে চাঁদা চাওয়া হচ্ছে, আর শিশুটি যাত্রীদের কাছ থেকে এক দুই পাঁচ টাকা করে করে তুলছে। এক সময় মাইকের

আওয়াজ দূরে চলে গেছে। শিশুটি সবার কাছে গিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের কথা বলে টাকা নিচ্ছে।

কিন্তু টাকা নেয়ার জন্য শিশুটি যে স্বর ও সুর ব্যবহার করছিল তা শুনে আমার হৃদয় রীতিমত কেঁপে উঠেছে। কারণ, যাত্রীরা মাইকের আওয়াজ শুনেছে, প্রতিষ্ঠান সরাসরি দেখেছে। শিশুটি শুধু প্রতিষ্ঠানের দিকে ইঙ্গিত করেই টাকা নিতে পারতো। শুধু হাত পাতলেই চলত। হাত পাতার প্রশিক্ষণ পর্যন্তই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকতো।

কিন্তু শিশুটি এতটুকুর উপর ক্ষান্ত করেনি। সে ইনিয়ে বিনিয়ে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের ফযীলত বুঝিয়ে এবং সীমাহীন অসহায়ত্বের চিত্র তুলে ধরে ধরে হাত পাততে থাকল। আমার তখন মন চেয়েছিল, চিৎকার করে সে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের পায়ে জড়িয়ে ধরি। করুণ সুরে নিবেদন করি, আল্লাহর ওয়াস্তে এত পূতপবিত্র কচি হৃদয়গুলোকে এভাবে নিজেদের হীন স্বার্থের বলি বানাবেন না! আর যদি বলেন, আপনারা স্বার্থবাজ নন, তাহলে বলব, আপনাদের অজ্ঞতার বলি বানাবেন না।

কিন্তু আমি জানি, আমার এ চিৎকারের কষ্ট ও ব্যথা আমার সহযাত্রীরাও গ্রহণ করবে না। কারণ, তাদের একটি প্রশ্নের কোন উত্তর আমার কাছে নেই। প্রশ্নটি হচ্ছে, আপনারাও তো তাই করেন। এরা করলে সমস্যা কী? দুয়ের মাঝে ব্যবধান কী? আসলেই ব্যবধান আমার জানা নেই।

এ অংকতে সমস্যা কী?

খ. আমার হিসাব মতে কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দ, যুবকের ছোট্ট দলটি এবং কচি শিশুরা -এদের সামষ্টিক সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় দশ/বার জন। যাদের অর্ধেক পরিপূর্ণ কাজ করার সামর্থ্য রাখে, আর বাকি অর্ধেক যেকোন কাজের সহযোগিতা করার মত যোগ্য।

এ হিসাবে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য তারা অপরিচিত সফররত যাত্রীদেরকে বিরক্ত করার পেছনে যে সময়, মেধা ও খাটুনি ব্যয় করে থাকে সে সময়, মেধা ও খাটুনি যদি তারা কোন 'কাসবে হালালে'র পথে ব্যয় করতো, যোগ্যতা অনুযায়ী কেউ দিনমজুর খাটতো, কেউ রিক্সা চালাতো, কেউ গাড়ির হেলপারি করত, কেউ দোকানে চাকুরী করত, কেউ কম্পিউটার কম্পোজের কাজ করত, কেউ সবজি ক্ষেত করত, কেউ টুপি

বানাতো, কেউ সাজি, কুলা চালনি বানাতো, মোটকথা যে যেটা পারতো এবং যতক্ষণ পারত ততক্ষণ করলে আমার ধারণা মতে তারা গড়ে ন্যূনতম তিনশত টাকা করে কামাই করতে পারতো।

এ হিসাবে অংক তিন হাজার ছয়শ না হয়ে যদি দুই হাজারও হয় তবু কি তা এ কাজ থেকে উত্তম ছিল না? আমি তো ততটুকু সময়, মেধা ও খাটুনির কথাই বলছি যতটুকু ব্যয় চলছে। তাহলে এরপর পেশ করার মত ওযর আর কী থাকতে পারে?!

দ্বীনকে ছোট করে, ইলমে দ্বীনকে ছোট করে, নিজেকে ছোট করে, মানুষদেরকে বিরক্ত করে আমরা যা করতে চাচ্ছি তা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আমার উপর কী হুকুম রয়েছে? আর যা করতে চাচ্ছি না তা করার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কী নিষেধ রয়েছে? বিষয়গুলো কি একান্তই মানসিক দুর্বলতা নয়। একান্ত পরিনাম সম্পর্কে বেখবর হওয়ার কারণে নয়?

একজন মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে দ্বীনের দরদী হয়ে থাকে এবং সে শরীয়তের গণ্ডির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে আমার এ অংকটি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তার দলিল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব কী? আমার মনে পড়ে এক মসজিদের মধ্যবয়সী এক মুয়াযযিনের কথা-

ঐ সে কথাও মনে পড়ে

আমি সে মসজিদের মুসল্লি। ইমাম-মুয়াযযিন দু'জনই আমাকে মুহাব্বত করেন -এমন আলামত তাঁরা বিভিন্ন সময় প্রকাশ করে থাকেন। এক ফজরের পর আমি মুয়াযযিন সাহেবের সঙ্গে মসজিদে বসে বসে কোন এক বিষয়ে কথা বলছিলাম। এমন সময় এক স্কুল পড়ুয়া যুবক বলে মনে হল দুই প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে মুয়াযযিন সাহেবের সামনে এসে বসল। বিস্কুট দুই প্যাকেট মুয়াযযিন সাহেবের সামনে রেখে আদবের সাথে নিবেদন করল, হুজুর! আব্বার জন্য একটু দোয়া করিয়ে দেবেন। হুজুর বললেন, জি ইনশাআল্লাহ!

যুবক প্রশান্তচিত্তের একটি হাসি দিয়ে মুসাফাহা করে সালাম দিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় হুজুর বলে উঠলেন, হুজুরের হাদিয়া কোথায়? যুবক ভ্যাবাচেকা খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে পড়ল। মনে হলো হুজুরের কথা সে বুঝতে পারেনি। যুবকের অপ্রস্তুত অবস্থার উপর হুজুর খুব পেরেশান

হয়েছেন বলে মনে হল না। হুজুর খুব সুন্দর করে বললেন, হুজুরের জন্য হাদিয়া দিবেন না? বিস্কুটের প্যাকেট দেখিয়ে বললেন, এটাতো যারা দোয়ায় শরিক হবে তাদের জন্য।

যুবককে দেখে আমার মনে হল, সে আলাদা হাদিয়ার তত্ত্বটা না বুঝেও বোঝার ভান করে বলল, জি জি! কত জানি? কত হলে হবে? হুজুর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, সেটা কোন সমস্যা নয়। একশ দু'শ যা-ই দেন, অসুবিধা নেই। যুবক জি জি ঠিক আছে বলে চলে গেল? আমার মনে হল, যুবক অনাকাঙ্ক্ষিত অজানা অনেক প্রশ্ন ও অনেক প্রশ্নের উত্তর মাথায় নিয়েই উঠে গেল।

যুবক বিদায় নেয়ার পর আমি একটু মনের কষ্টের সাথে বললাম, টাকার এতো বেশি প্রয়োজন হলে রিক্সা চালাতে পারেন না, বা দিন মজুর কাজ করতে পারেন না?! বললেন, আরে বলেন কি? এটা আমাদের জন্য মানায় না কি? আমি বললাম, একটু আগে যা করেছেন তা কি আপনাদের জন্য খুব মানায়? বললেন, এটাতে কী সমস্যা? এরকমইতো নিয়ম। আমি এর জবাবে শুধু 'ও' বলে কথা শেষ করতে চাইলাম এবং বিদায় নিলাম।

একটি কথা বলার মধ্যে প্রায়ই আসে, হয়তো কোথাও লিখেছিও। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সে কথাটি আজ আবার লিখতে মনে চাচ্ছে-

যেসকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সম্মান-ইজ্জত বৃদ্ধি পেত সেসকল কাজে আজকের উম্মতের এমনকি উম্মতের কর্ণধারদেরও সম্মান ও ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর যেসকল কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ইজ্জত নষ্ট হয়ে যেত সেসকল কাজে আজকের উম্মতের এবং উম্মতের কর্ণধারদের সম্মান ও ইজ্জত বেড়েই চলেছে। নবী ও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আমাদের বিপরীত রকমের একটা মিল আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে চলেছি। কারণ আমরা নবীর ওয়ারিস হওয়ার দাবিদার এবং সাহাবায়ে কেরামকে মাপকাঠি বলে দাবি করতে পছন্দ করি।

কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়েছি। বলছিলাম, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষ, যুবক ও শিশুদের যে কাফেলাটি নিজেদের সময়, মেধা ও খাটুনি ব্যয় করে অপরিচিত যাত্রীদের বিরক্তি কামাই করে চলেছে, তারাই যদি তাদের সমপরিমাণ সময়, মেধা ও খাটুনি ব্যয় করে সাধারণ কোন কাজ করত, তাহলে এ হাতগুলো আর ভিক্ষার হাত হত না,

অপরিচিত যাত্রীদের বিরক্তির কারণ হত না, অতিরিক্ত কোন কিছুই ব্যয় হত না।

কিন্তু আমরা ইজ্জত ও সম্মানের মাপকাঠি নির্ধারণে ভুল করে ফেলেছি। অথবা ইজ্জত ও সম্মানের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে 'ময়দানে তীহে' ঘুরছি। অথবা আমাদের উদ্দেশ্য ভালো নয়।

এ অঙ্গটি কেটে ফেলাও মুশকিল

এ অংশটিকে বিচ্ছিন্ন, নষ্ট ও নিচু বলে কেটে ফেলে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ, মূল ধারার সঙ্গেও তাদের একটা যোগসূত্র আছে। সেটা খুলে বললে এভাবে বলা যায় যে-

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের ধারক-বাহকগণের মধ্যে যারা শীর্ষস্থানে অবস্থান করছেন তাঁদের অনেকে এ সকল বিচ্ছিন্ন, নষ্ট ও নিচু পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের হয়তো উপদেষ্টা, নয়তো আমন্ত্রিত মেহমান, নয়তো তাদের ইসলাহী মুরুব্বী, নয়তো কমপক্ষে শুভাকাঙ্ক্ষী।

আর সে সুবাদে বিচ্ছিন্নদের নিচু পদ্ধতিতে অর্জিত অর্থের অংশবিশেষ আমাদের ব্যবহারেও চলে আসছে। আর সে আসাটা আমাদের অজান্তে নয়, আমাদের জ্ঞাতসারেই হচ্ছে। তাই এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মত কোন অজুহাত আমাদের হাতে আছে বলে মনে হয় না। নিজের চোখে দেখে এবং নিজের কানে শুনেও সুপরামর্শ না দেওয়ার কী ওজর থাকতে পারে? আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

তিন. উত্তোলনকারীর জন্য শতকরা পঞ্চাশ থেকে আশি ভাগ পর্যন্ত বরাদ্দ দিয়ে লিল্লাহবোর্ডিং -এর জন্য টাকা উত্তোলন

বিষয়টি সরাসরি হালাল-হারামের। দায়িত্বও দারুল ইফতার এবং বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের। মুফতিয়ানে কেরামের কেউ কেউ এ শতকরা হারকে নাজায়েয বলেছেন, আবার অনেকেই বাজার দর হিসাবে সহনশীল পর্যায়ের শতকরা একটি হারকে বৈধ বলেছেন। এ বিষয়ে আমার কোন কথা নেই। মুফতিয়ানে কেরাম দলিলের আলোকে যে হারকে বা যে অংককে বা যে পদ্ধতিকে বৈধ বলে ফাতওয়া দেবেন সে আলোকে আমাদের চলা জরুরী।

আমি শুধু নিবেদন করতে চাই, শিরোনাম যখন এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং হয়েছে তখন এর দায়িত্বশীলগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, এতিমদের জন্য এবং লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য যে কোন টাকাই হালাল এবং যে কোন পদ্ধতিতেই আসুক তা হালাল। অপর দিকে তাঁরা নীতিগতভাবে এ সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন যে, যে কোন শর্তের বিনিময়ে হোক এ তহবিলে টাকা জমা হওয়া চাই। টাকার পরিমাণ যাই হোক এবং টাকা আসার পদ্ধতি যাই হোক।

অপর দিকে উত্তোলনকারী যখন এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের শতকরা আশি ভাগ টাকা নিজের পকেটে নেয়ার মত হিম্মত করে ফেলেছে, তখন সে আর কোথাও হিম্মত হারায়নি। হিম্মত হারানোর প্রশ্নই আসে না। সে যখন হিসাব করে দেখেছে, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য এক কোটি টাকার রশিদ কাটা মানেই হচ্ছে আশি লক্ষ টাকা তার নিজের পকেটে, তখন সে এ অংক মিলানোর জন্য সব কিছু করার হিম্মত করে ফেলেছে।

আমাদের দেশের সাধারণ ভিক্ষুকরা দু'চার টাকার ভিক্ষা পাওয়ার জন্য কত জীবিত মা-বাবাকে মৃত বানিয়ে ফেলেছে এবং মৃত মা-বাবার জন্য কাফনের টাকা ভিক্ষা করেছে, করে চলেছে, সে দেশের রাজফকিররা ও আন্তর্জাতিক ফকিররা লক্ষ লক্ষ টাকার জন্য কী না করতে পারবে? এতে যদি দ্বীন, ধর্ম, ইলম, মাদরাসা, দারুল উলূম, হামেলে ইলমে ওহির চির জীবনের সকল অর্জনও মাটির নিচে তলিয়ে যায় বা আগুনে পুড়ে যায় বা স্রোতে ভেসে যায় তাতে মধ্যসত্বভোগীর সমস্যা কী? সেতো দাতাও নয়, গ্রহীতাও নয়। সেতো শুধুমাত্র মধ্যসত্বভোগী।

সে যদি কোন দাতাগোষ্ঠীকে গিয়ে বলে, অমুক এতিমখানা আগুন লেগে পুড়ে গেছে, বা অমুক লিল্লাহবোর্ডিংয়ের এক হাজার ছাত্র গত একমাস থেকে শুধু কলা গাছের মূল সিদ্ধ করে খেয়ে বেঁচে আছে এবং এসবের ভিডিও চিত্রও দেখিয়ে দেয়, তাহলে এতে এ মধ্যসত্বভোগীর কী সমস্যা? সমস্যাতো হচ্ছে, দ্বীনের, ইলমে দ্বীনের এবং দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকগণের।

কিন্তু এসব সমস্যা আজ আমাদের কানের মাছিও তাড়াতে পারছে না। অথচ ঘটনা ঘটে চলেছে। না ঘটার কোন কারণ নেই। এসবের উদাহরণ দিলে পাঠক মন খারাপ করে ফেলেন, আর উদাহরণ না দিলে বিশ্বাস করতে চান না। আমরা পড়েছি দ্বিমুখী সমস্যায়। 'বললে মা মার খায়, আর না বললে বাবা হারাম খায়' সে পুরাতন প্রবাদই আবার মনে আসছে।

বাস্তব সমস্যার অনেক কিছু কর্তৃপক্ষ জেনে শুনে মেনে নিচ্ছে। নীরব থাকাকে কৌশলগত অবস্থান হিসাবে গ্রহণ করে দুধের গরুর লাথি খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হিসাবে সব কিছুর উপর মৌন সমর্থনের সীল মেরে চলেছে। আর শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করে, আদেশ নিষেধের গলায় ছুরি চালিয়ে নিজেদের আবিষ্কৃত হেকমত নামের এক বায়বীয় পদার্থের আড়ালে সকল নিষিদ্ধ বিষয়ের বৈধতা নিশ্চিত করা চলছে।

চার. টাকা যখন বিদেশ থেকে আসে তখন তা কোন প্রকারের টাকা তা তাহকীক করার প্রয়োজনীয়তার শতভাগ বিলুপ্তি

রাজফকির ও আন্তর্জাতিক ফকিরদের মাধ্যমে যখন দেশের বাহির থেকে টাকা আসে তখন সে টাকার খাত নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয় না। আয়ের খাত যখন বিদেশ তখন তা ওয়াজিব সদকা না কি নফল দান তা তাহকীক করতে যাওয়া অবান্তর। কারণ বিদেশ বলে কথা। আর ব্যয়ের খাত যখন এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিং তখনও তা কোথা হতে কীভাবে এসেছে তা তাহকীক করতে যাওয়া মানে অযথা সময় নষ্ট করা।

রাজফকির ও আন্তর্জাতিক ফকিরবর্গ সাধারণত এতিমখানা ও লিল্লাহ-বোর্ডিংয়ের সহযোগিতার (?) প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে। কারণ, এ দু'টি পরিভাষার আরবী ভার্সন খুবই উপযোগী ও ফলদায়ক।

এরই বিপরীত মাদরাসা, দারুল উলূম, জামেয়া ইত্যাদি শব্দ ও পরিভাষা টাকা উত্তোলনের জন্য একেবারেই উপযোগী নয়। পরিভাষাদু'টি বাইরের দেশগুলোতে মাদরাসা ও ইলমের অঙ্গন হিসাবে পরিচিত না হওয়ার কারণে এর অনেক বাড়তি সুবিধাও রয়েছে। এ সুযোগটি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষ ও সহযোগী পক্ষ কেউই হাতছাড়া করেনি।

এ ক্ষেত্রে যে অসত্যগুলো বলতে হয় এবং খরচ করার ক্ষেত্রে যে ব্যবধানগুলো করতে হয় তার সমাধান আগেই সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের ধারক-বাহকগণ মনে করেন, একটি মাদরাসা ও দারুল উলূমের জন্য এর চাইতে উপযোগী আর কোন পরিভাষা হতে পারে না।

তাই যত কিছুর বিনিময়েই হোক না কেন পরিভাষা দু'টিকে টিকিয়ে রাখতেই হবে এবং মাদরাসার পরিচায়ক অন্যান্য সকল শব্দ ও পরিভাষার উপর ফলাও করে এ পরিভাষা দু'টিকেই চোখে পড়ার মত করে প্রকাশ করতে হবে।

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য উত্তোলিত দেশী টাকাকে খাত বদল করে খরচ করার জন্য যতটুকু বাহানা গ্রহণ করাকে জরুরী মনে করা হয়, বিদেশী টাকার ক্ষেত্রে সে প্রয়োজনটুকুও অনুভব করা হয় না। বিদেশ থেকে আসার কারণে তা সবার জন্য সর্বাঙ্গিন 'মালে তায়্যিব' হিসাবে পরিগণিত হয়। এতে সবার সমান অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যায়।

আর যদি বিদেশ থেকে আগত উপার্জন টাকা না হয়ে বস্তু সামগ্রী হয় তাহলে বিষয়টি আরো সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন যিনি যে বস্তুর উপর হাত রাখবেন সেটি তার হয়ে যায়। বিশেষত এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের সঙ্গে যে কোন প্রকার কোন সূতার টান থাকলেই হল।

খাত বদলের পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করারতো প্রশ্নই আসে না; বরং বস্তু সামগ্রী হচ্ছে দখলসূত্রে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার মত বিষয়। আর এসব বিষয়ে কোন প্রকার রাখঢাকের প্রয়োজনবোধও করা হয় না।

একটি দুর্ঘটনা

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আর না বললেই নয়। বিদেশ থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য বস্তাভর্তি কিছু একটা এসেছিল। তখন এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামভক্তদের একজন ভরা মজলিসেই গল্পের আবেশে শুনাতে থাকলেন-

"গিয়েছিলাম ..... অফিসে। কয়েকটা প্যাকেট সামনে ছিল। কী করা যায় ভাবছিলাম। .... সাহেব চোখের ইশারায় বললেন সরিয়ে ফেলেন, ঐ কয়টা নিয়ে যান। আস্তে করে জায়গা থেকে সরিয়ে ফেললাম। পরে গাড়ি একটা ডেকে এনে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম"।

বক্তার ধারাভাষ্যে যতই উৎসাহ ঝরে পড়ছিল ততই আমি নিভে যাচ্ছিলাম। বক্তার বড়ত্বের কারণে হোক বা তার অস্বাভাবিক উৎসাহের কারণেই হোক আমি তাকে কিছু বলতে হিম্মত করিনি। আমার এ দুর্বলতার জন্য আমি লজ্জিত।

আমি হিম্মত করে আগ্রহী শ্রোতাদের একজনকে বললাম, এটাতো এভাবে নেয়ার অধিকার আপনাদের নেই। কিন্তু আপনাদের ধারাভাষ্য এবং উৎসাহের আমেজেতো মনে হয়, আপনারা খুব ভালো একটা কাজ করেছেন। তিনি আমাকে অম্লান বদনে জবাব দিলেন, সমস্যা কী? এটাতো সবাই করে। কতজন আরো কত বেশি নিয়ে যায়। আমরাতো দু'চারটা নিয়েছি। তিনি আমার অবাক হওয়ার উপর খুব অবাক হলেন।

আমি বললাম, হারাম বিষয় হালালে পরিণত হওয়ার জন্য দলিল কি এটাই যে, সবাই করে? আমি তাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, দেশের শত ভাগের শত ভাগই যদি চোর হয়ে যায় তাহলে কি দুই টাকার টিকিট না করে আপনার জন্য রেলগাড়িতে চড়া জায়েয হবে? যে রেলগাড়িতে চেক নেই, টিটি নেই, টিকিট মাস্টার নেই, গেইট নেই?

আমার এ প্রশ্নের জবাবে তিনি যে কথাটি বলেছেন তা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তিনি বলেছেন, মামা! বিষয়টাকেতো আসলে কখনো ঠিক এভাবে ভাবিনি। বিষয়টাতো এমনই হওয়ার কথা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

পাঁচ. লিল্লাহবোর্ডিং এর খরচে দেশ-বিদেশ সফর করতে গিয়ে নিজের হাজারো প্রয়োজন সেরে নেয়ার প্রকাশ্য মহড়া

অজ্ঞতাবশত বা ধোঁকা দেওয়ার জন্য এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাকে এবং চাঁদা সংগ্রহকারীকে অনেকে যাকাত উসূলকারী হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে থাকেন। এ ধোঁকার জবাবে কিছু বলার বিশেষ ইচ্ছা আমার নেই।

যে পৃথিবীতে কুফরী গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে জিহাদের দায়িত্ব আদায় করার মহড়া চলছে, কুরবানীর গরুর রক্ত দিয়ে শহীদ হওয়ার সাওয়াব পাওয়ার উৎসাহ দেওয়া চলছে, মানুষের দ্বারে দ্বারে চাঁদার থলি নিয়ে ফিরে ফিরে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আদায়ের তৃপ্তি পরিতৃপ্তির ঢেকুর চলছে, ইসলাহী মুরুব্বীর ইসলাহী কোর্স শেষ হওয়ার পর খলিফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীনের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে -সে পৃথিবীতে লিল্লাহবোর্ডিংয়ের চাঁদা করে যাকাত উসূলকারীর দায়িত্ব আদায় করলে এতে আমরা নতুন করে অবাক হতে চাই না।

দু'টি বিন্দু

আমাদের আলোচনা এখানে দু'টি বিন্দুতে:

প্রথম বিন্দু

এক. যারা এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের জন্য চাঁদা করাকে খলিফাতুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকে যাকাত উসূলকারীর পর্যায় মনে করেন তারা 'ইবনুল লুতবিয়্যা'র সে প্রসিদ্ধ হাদীসটি স্মরণ রাখেন না কেন? এত বড় যিম্মাদার হয়ে ইবনুল লুতবিয়্যার হাদীস জানবেন না বা জানলেও আমলে আনবেন না এটা কোন গ্রহণযোগ্য ওযর হতে পারে না। পাঠকদের শুধু স্মরণ করানোর জন্য হাদীসটি আমি এখানে উল্লেখ করছি-

﴿حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن

كنت صادقاً، ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد! فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت. بصر عيني وسمع أذني﴾ **(صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له، رقم الحديث: ٦٩٧٩)**

"আবু হুমাইদ আসসায়েদী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বনু সুলায়মের সাদাকা-যাকাত উসূল করার দায়িত্বে নিয়োগ দিলেন। সে লোকটির নাম ছিল ইবনুল লুতবিয়্যাহ। সে যখন যাকাত উসূল করে ফিরে আসল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে হিসাব নিলেন। তখন সে বলতে থাকল, এটা আপনাদের (অর্থাৎ বাইতুল মালের), আর এটা আমার জন্য হাদিয়া।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার দাবিতে যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি তোমার বাবার ঘরে আর তোমার মায়ের ঘরে বসে থাকলে না কেন?! বসে থেকে দেখতে তোমার কাছে হাদিয়া আসে কি না?

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন করে বয়ান করলেন। আল্লাহর হামদ ও সানার পর বললেন, আল্লাহ তাআলা আমার উপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেসব দায়িত্বের কোন কোন দায়িত্বে আমি তোমাদের কাউকে নিয়োগ দিই। এরপর সে এসে বলে, এটা তোমাদের, আর এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে।

যদি এমনই হয় তাহলে কেন তোমরা তোমাদের বাবার ঘরে আর মায়ের ঘরে বসে থাকলে না। বসে থেকে দেখতে তার কাছে তার হাদিয়া আসে কি না?

আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ যদি অন্যায়ভাবে কোন কিছু গ্রহণ করে থাকে তা হলে অবশ্যই সে তার বোঝা নিয়েই আল্লাহর মুখোমুখী

হবে। আমি তোমাদের একেক জনকে চিনতে পারব, যে উটের বোঝা বহন করে আল্লাহর মুখোমুখী হবে, যে উট হ্রেষা ধ্বনি দিতে থাকবে। কেউ গরুর বোঝা বহন করবে, যে গরুর হাম্বা ধ্বনি থাকবে। কেউ ছাগলের বোঝা বহন করবে, যে ম্যাঁ ম্যাঁ আওয়াজ করতে থাকবে।

এর পর তিনি উভয় হাত এত উপরে উত্তোলন করলেন যে বগলের নিচের শুভ্র অংশও দেখা গিয়েছে এবং প্রার্থনা করে বলতে থাকলেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়েছি। আমার চোখ দেখেছে এবং আমার কান শুনেছে"। -সহীহ বুখারী, কিতাবুল হিয়াল হাদীস নং ৬৯৭৯

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা রাখেননি। সম্ভাব্য যত ধরনের ব্যাখ্যা অপব্যাখা আমরা করব তার সবগুলো তিনি চৌদ্দশত বছর আগেই নাকচ করে দিয়েছেন।

কিন্তু আমরাতো ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এমন প্রতিভার অধিকারী যা শরীয়তের 'ইবারতুন নাস', 'মুতাওয়াতির' 'মুহকাম'কেও মাটিচাপা দিয়ে দিতে পারে। আমাদের এ প্রতিভার কোন তুলনা হয় না। আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে হেফাযত করুন।

কর্তৃপক্ষের সমস্যা হচ্ছে, তাঁরা এ বিষয়গুলো জানেন। কিন্তু এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের স্বার্থে এ বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া এবং দেখেও না দেখার ভান করাকে জরুরী মনে করেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ জরুরী মনে করার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোন মানদণ্ড আছে কি না? এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের দায়িত্বশীলগণও সে মানদণ্ডের আওতাভুক্ত কি না? তাঁদের ব্যাপারে তাঁদের কী ধারণা, তাঁদের ব্যাপারে আমাদের কী ধারণা এবং শরীয়তের মাসআলা এ বিষয়ে কী বলে?

দ্বিতীয় বিন্দু

দুই. যারা এ চাঁদা সংগ্রহকে যাকাত উসূলের সঙ্গে তুলনা করেন না তারা এ লেন-দেনটি কোন প্রকারের তা পরিষ্কার করেন না কেন? এর প্রয়োজনীয় শর্তগুলো আলোচনায় এবং আমলে আনেন না কেন? এবং এসব বিষয় পরিষ্কার করার প্রতি তাদের কোন প্রকার আগ্রহ দেখা যায় না কেন?

এসব ক্ষেত্রে জায়েয-নাজায়েযের প্রশ্ন করা হলেই নির্ধারিত একটি উত্তর পাওয়া যায় তা হল, 'এখানে আসলেই খালি সব জায়েয-নাজায়েয

ভেসে ওঠে, আমরা কি সব জায়গায় জায়েয-নাজায়েয বেছে চলতে পারি? দ্বীন-ইলমে দ্বীন অস্তিত্বের সংকটে রয়েছে, আর আমরা আছি জায়েয-নাজায়েযের ফতোয়া নিয়ে'। বা এ ধরনের অর্থবোধক কোন জবাব।

অর্থাৎ দ্বীনকে কুরবান করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লড়াই। এমন পরিস্থিতিতেই সন্দেহ জাগে, আসলে লড়াইটা কিসের? দ্বীনের না দুনিয়ার। কেউ চাইলেই প্রশ্নের এ মুখ বন্ধ করতে পারবে না।

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের একজন চাঁদা সংগ্রহণকারীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের চুক্তি কী? তা পরিষ্কার হতে হবে এবং তা শরয়ী মানদণ্ডেই হতে হবে। চুক্তিটি ইজারা চুক্তি হলে এর বিধিবিধান ভিন্ন। স্বভাব প্রকৃতি ভিন্ন। শর্তাবলী ভিন্ন। ইজারা চুক্তি হলে তা কোন প্রকারের ইজারা তা নির্ধারণ করা জরুরী। তাবাররু' চুক্তি হলে তার স্বভাব প্রকৃতি ভিন্ন। শতকরা হারের চুক্তি হলে তার বিধিবিধান ও স্বভাব-প্রকৃতি ভিন্ন।

মোটকথা হচ্ছে, চুক্তির ধরন নির্ধারিত হতে হবে। চুক্তির ধরন নির্ধারণ না করে এসব কাজের অনুমোদন কীভাবে বৈধতা পেতে পারে! চুক্তির ধরন নির্ধারণ হওয়ার পর ধরন হিসাবে এর মাসআলা সামনে আনতে হবে। এর শর্তাবলী সামনে আনতে হবে।

যেসব কারণে একটি চুক্তি বতিল বলে গণ্য হয় সেসব কারণ ঘটলে চুক্তি বাতিল করতে হবে। একটি চুক্তি বাতিল হলে পরে যা করতে হয় তা করতে হবে। চুক্তি ফাসেদ হলে যা করতে হয় তা করতে হবে। কিতাবের কথাগুলোকে বাস্তব জীবনে আনতে হবে। কিতাবের কথাগুলোকে যদি সবার আগে কিতাবওয়ালারাই ছুড়ে ফেলে দেয় তাহলে অন্যদের বিচার কে করবে?

আরেকটি দুর্ঘটনা

কথায় কথায় আরেকটি দৃশ্যও মনে পড়ে গেল-

এক সময় খুব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল এমন একটি লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম পছন্দ করেন এমন একজনের সঙ্গে। সে লেন-দেনটি শতভাগ হারাম ছিল এবং প্রকাশ্য সুদভিত্তিক ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে হামেলে ইলমে ওহির দাবিদারদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল।

সে লেন-দেন সম্পর্কেই আলোচ্য মুহতারামকে যখন বলা হল যে, এ লেন-দেনটি হারাম এবং তা হালাল হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তখন তিনি

রাগত স্বরে উপরে নিচে ডানে বামে দুই হাত নাচিয়ে প্রায় ধমকের মতই বলতে থাকলেন, এটাও হারাম! এটাও হারাম! ওটাও হারাম! তা হলে আমরা যাব কোথায়?!

আমি ভয়ে ভয়ে আহত স্বরে শুধু বলেছিলাম, আল্লাহ তাআলা যখন হারাম বর্জন করতে বলেছেন এবং হালাল খেতে বলেছেন তখন হালালের জন্য যাওয়ার জায়গাও কোন একটা থাকবে। হালালের রাস্তা না থাকলে হালাল খাওয়া ওয়াজিব হয় কীভাবে?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, হারামকে হারাম বলার উপরও আমাদের অনেক মনোকষ্ট। যেমনিভাবে ভুলকে ভুল বলার উপর আমাদের মনোকষ্ট ও আপত্তির কোন শেষ নেই। হারামের উপর শত বছর পার হলে যেমনিভাবে তা হালাল (?) হয়ে যায়, এমনিভাবে ভুলের উপরও শত বছর পার হয়ে গেলে তাকে আর ভুল বলা যায় না। আর ভুলটাই শুদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলিল হচ্ছে তার উপর অতিক্রান্ত শত বছর।

ছয়. লিল্লাহবোর্ডিংয়ের দানবাক্স

আমাদের শিরোনাম যেহেতু এতিমখান-লিল্লাহবোর্ডিং সেহেতুে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সবকিছুর আগে তৈরি করতে হয় দানবাক্স। এতিমখানার দানবাক্স, লিল্লাহবোর্ডিংয়ের দানবাক্স। এমন হওয়াটা খুবই সংগত।

একটি অনাথ আশ্রম ও লঙ্গরখানার প্রথম কাজই হচ্ছে অসহায় ছিন্নমূল মানুষদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয়ত পোশাকের, আর তিন নম্বরে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা। তাই দানবাক্সের উদ্বোধনের মাধ্যমেই একটি এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিংয়ের সূচনা হওয়া চাই। এখানে সমস্যা হওয়ার সংগত কোন কারণ নেই।

সমস্যা হয়েছে অন্য জায়গায়। এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের উপরে বা নিচে লেখা আছে 'জামেয়া ফুলানিয়া' বা 'মাদরাসা ফুলানিয়া' বা 'দারুল উলূম ফুলানিয়া'। এখানেই এসে বিপত্তি বেঁধেছে। স্বভাবতই কৌতূহলীদের চেহারায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন ভেসে ওঠে যে, একটি জামেয়া বা একটি মাদরাসা বা একটি দারুল উলূমের সর্বপ্রথম কাজ দানবাক্স তৈরি কেন? ফরয ইলমের সঙ্গে দানবাক্সের কী সম্পর্ক? ইলমে ওহি শেখা ও শেখানোর সূচনা দানবাক্স দিয়ে হবে কেন?

প্রবাহ এখানেই থেমে যায়নি। হোটেলে, স্টেশনে, চায়ের আড্ডাখানায়, রাস্তার মোড়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে, কবরস্থানের সদর দরজায়, প্রসিদ্ধ মাজারে, অত্যন্ত খারাপ মানুষদের চোখের সামনে ঝুলছে এতিমখানা-লিল্লাহ-বোর্ডিংয়ের দানবাক্স। এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের উপরে বা নিচে শোভা পাচ্ছে কোন দারুল উলূমের নাম, কোন মাদরাসার নাম, বা কোন জামেয়ার নাম।

এখন আর দলিলেরও প্রয়োজন নেই, আকাবিরেরও প্রয়োজন নেই

আমরা এতসব করে চলেছি। এর পেছনে দলিলের কোন প্রয়োজন নেই। এক সময় দলিলের পরিবর্তে আকাবিরের উদ্ধৃতি শোনা যেত। এখন আর আকাবিরের উদ্ধৃতিও শোনা যায় না। তবে হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিক আন্দাযে আকাবিরের একটা উদ্ধৃতি এ ক্ষেত্রেও শোনা যায়। তা হচ্ছে, 'আকাবির যদি আমাদের উদ্ভাবিত এ পদ্ধতিগুলো দেখতেন তাহলে তাঁরা তা পছন্দ করতেন'।

﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ (الأحزاب:١١)

এখানে এসেই হাকীকত আমাদের হাতে ধরা দেয়। আমাদের পুরাতন দু'টি কথার সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায়।

একটি কথা ছিল, মতলবের জন্য আমরা কত আকাবিরকে মঞ্চ থেকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছি তার কোন হিসাব নেই। **আরেকটি কথা ছিল**, লক্ষ আকাবিরের কোন একজনের জীবনের লক্ষ মুহূর্তের যে মুহূর্তটি দিয়ে আমার মতলব উদ্ধার সম্ভব সেটিকেই আমরা বড় থেকে বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

আর আজ যখন আমাদের অপকর্মের বা অন্যায়ের পক্ষে দলিলও পাওয়া যায়নি এবং আকাবিরের উদ্ধৃতিও পাওয়া যায়নি তখন আমরা এবারত তৈরি করলাম, 'যদি আকাবির আমাদের এসব উদ্ভাবন দেখতেন তাহলে তাঁরা খুব পছন্দ করতেন'।

কিন্তু এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কর্ণধারদের এ কথাও জানা নেই যে, এর বিপরীতে আকাবির ওলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্যও রয়েছে। তাঁদের লিখনীতে রয়েছে। তাঁদের জীবনীতে রয়েছে। তাই কথা সে আগেরটাই। এসব মায়াকান্না সত্যের জন্যও নয়, দ্বীনের জন্যও নয়। এসব মায়াকান্না হচ্ছে মতলবের জন্য। মতলব বড় উপাদেয় জিনিস।

বিদআতের উদ্ভবও এভাবেই হয়েছে

পৃথিবীতে প্রচলিত যত ধরনের বিদআ'ত রয়েছে তাদের বিদআ'তকে বিদআত বললে এবং আল্লাহর রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম যা করেননি তা তোমরা কেন করছ -এমন প্রশ্নের জবাবে তাদের একটি সহজ সরল জবাব হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম এ আমলগুলো দেখলে পছন্দ করতেন।

অর্থাৎ কোন বিষয়ে শরয়ী সিদ্ধান্তের জন্য পেছনে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। উদ্ভাবন, বৈধতাদান, অপরিহার্যকরণ এবং এর প্রচার প্রসার সব একই কেন্দ্রবিন্দু থেকে সম্ভব। মাসআলার ব্যবধানে দলিলের ব্যবধানে দলিল সংগ্রহ ও উপস্থাপনের ব্যবধান অনেকটা এ রকম-

মুনাযারা যখন হবে ভাণ্ডারী, আটরশী, দেওয়ানবাগী ও রাজারবাগীর সঙ্গে তখন দলিল হচ্ছে-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ﴾. **(موطأ الإمام مالك: ٧٥٤)**

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'টি বস্তু আমি তোমাদের মাঝে রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততদিন তোমরা ভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব, আরেকটি হচ্ছে, তাঁর নবীর সুন্নত'।

আর মুনাযারা যখন হবে গায়রে মুকাল্লিদ বা সালাফী দাবিদারদের সঙ্গে তখন দলিল হচ্ছে-

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ **(النحل: ٤٣)**

'অতএব তোমরা আহলে যিকর তথা ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান'।

আর মুনাযারা যখন হবে নিজের উদ্ভাবিত অপকর্মের পক্ষে তখন দলিলের রূপ হচ্ছে-

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

(مسند أحمد، رقم الحديث: ٣٦٠٠)

'অতএব মুসলমানরা যাকে ভালো মনে করবে তা আল্লাহর কাছে ভালো। আর মুসলমানরা যাকে মন্দ মনে করবে তা আল্লাহর দরবারে মন্দ'।

বলাবাহুল্য, এ দলিলগুলোর প্রত্যেকটিই আপন জায়গায় গ্রহণযোগ্য এবং ফলদায়ক। কিন্তু আমরা যে সমস্যাটি করে চলেছি তা হচ্ছে, নিজের প্রয়োজনের সময় আমরা একটি দলিলের কথা মনে রাখি এবং বাকি দু'টিকে বেমালুম ভুলে যাই। প্রথমটি গ্রহণ করার প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় তৃতীয়টিকে ভুলে যাই। দ্বিতীয়টি দিয়ে কাজ উদ্ধার হবে বলে মনে হলে প্রথম ও তৃতীয়টিকে ভুলে যাই। আবার যখন তৃতীয়টিকে যুতসই মনে হয় তখন প্রথম ও দ্বিতীয়টিকে ভুলে যাই।

শুধু ভুলে যাই না। নিজের নির্বাচিতটির বিপরীত প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে যে দলিলটিই আসবে তার বারটা বাজিয়ে দেওয়ার সকল ব্যবস্থা আমাদের কাছে আছে। অথচ ন্যায়সংগত আচরণ ছিল, সকল দলিলের সামষ্টিক বিবেচনা। আমরা তা করিনি এবং করি না। দলিলকে যদি দলিলের মত করেই বিচার করা হত তাহলে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং

শিরোনাম দিয়ে মাদরাসা, জামেয়া ও দারুল উলূম পরিচালনা করার মত লোক এ পৃথিবীতে পাওয়া যেত না।

আমাদের এ দ্বৈত ও তৃমুখী নীতির বিচার কে করবে? বিচারপ্রার্থীইতো করুণ অবস্থায় আছে। সুতরাং বিচারকের ফাঁসির হুকুমতো নিশ্চিত।

দুঃখজনক সারসংক্ষেপ

যাই হোক দারুল উলূম দেওবন্দের পরিচয়দানকারী এবং ক্ষেত্রবিশেষ মুখপাত্র হিসাবে পরিচয়দানকারী এবং আরো ক্ষেত্রবিশেষ একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশকারী ছোট হোক বড় হোক একটি কাফেলা দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার অনুসারী সকল দারুল উলূম, সকল মাদরাসা ও সকল জামেয়াকে এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিং হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

সফলতার (?) শুকরিয়া হিসাবে এখনো ইলমের আঙ্গিনাগুলোকে এবং একমাত্র স্বচ্ছ আঙ্গিনাগুলোকে জাতির সামনে অনাথ আশ্রম ও লঙ্গরখানা হিসাবে উপস্থাপন করে চলেছে।

এসব কিছুর বিনিময়ে আমাদের কপালে যা অর্জিত হয়েছে সে উপাখ্যানই এখন পাঠকদের শোনাব ইনশাআল্লাহ।

রমযানের শেষ দশ দিন

মুসলমানদের জন্য বছরের সেরা দশ দিন। আল্লাহ ওয়ালাদের আখেরাত কামানোর সেরা দশ দিন। দুনিয়াদারদের জন্য সেরা দশ দিন। দুনিয়া কামানোর সেরা দশ দিন। আল্লাহ ওয়ালারা দুনিয়াকে পেছনে ঠেলে দিয়ে মসজিদে স্থায়ী ঠিকানা করে বসে আছেন। আর দুনিয়া ওয়ালারা আখেরাতকে পেছনে ঠেলে দিয়ে নিজের ব্যবসা কেন্দ্রে স্থায়ী ঠিকানা করে বসে গেছে।

আর তৃতীয় একটি কাফেলা। তাদের না দুনিয়া হল, আর না আখেরাত হল। এ কাফেলার দাবি তারা আখেরাত নির্মাণ করে চলেছে। কিন্তু আখেরাত নির্মাণের মূলনীতির সঙ্গে এর কী মিল? রমযানের শেষ দশ দিনে তো আখেরাতমুখীদের ব্যবসা হল মসজিদের ইতেকাফ। মসজিদের বিপরীত দিকে গিয়ে সে ব্যবসার সম্ভাব্য ব্যবস্থা কী?

রমযানের শেষ দশ দিন তো হচ্ছে, আল্লাহর দরবার থেকে নেয়ার। সেই দশ দিনে বান্দার দ্বারে দ্বারে ফিরে আখেরাতের ব্যবসায় লাভবান হওয়ার

সম্ভাব্য পদ্ধতি কী? এতো আরাফার ময়দানের সে ভিক্ষুকের মতই হল, যে এমন দিনে আল্লাহর কাছে না চেয়ে মানুষের কাছে চাচ্ছিল, আর তাই আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে আচ্ছা রকমের কয়েক ঘা খেয়েছিল। সেই দশ দিন তো হচ্ছে সত্য বচন ও সত্য কথনের ব্যবসা। সেই দিনগুলোতে মিথ্যা বচন ও মিথ্যা কথন দিয়ে আখেরাত নির্মাণের পদ্ধতি কী?

আর যদি বাস্তবতা হয় দাবির বিপরীত। অর্থাৎ রমযানের শেষ দশ দিনে শতকরা পঞ্চাশ থেকে আশি ভাগের সুবর্ণ সুযোগ? তাহলে এ ব্যবসায় ব্যবসায়ী কী পেল, আর এর সুবাদে আমরা যারা এ পোশাকধারী, আমরা যারা মাদরাসা, দারুল উলূম ও জামেয়ার পরিচয়ে পরিচিত আমরা কী পেলাম?

এ সুবাদে আমাদের অর্জন হচ্ছে-

ক. কাপড় কেনার জন্য কাপড়ের দোকানে ঢুকতে গিয়েছি তো 'হুজুর একটু পরে আসেন' বলে আমাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

খ. নাস্তার দোকানে নাস্তা করার জন্য ঢুকতে গিয়েছি তো দরজায় থাকতেই বলা হয়েছে, 'হুজুর আজকে একটু ঝামেলায় আছি, আগামি কাল আসেন'।

গ. অলংকারের দোকানে অলংকার কিনতে গিয়েছি তো বড় মহাজন সাহেব প্রায় ধমকের মত করেই বললেন, 'হুজুর আপনাদেরকে না বলেছি সাতাশ রমযানের আগে আসবেন না'?

ঘ. অপরিচিত জায়গায় মসজিদ কোন দিকে তা জিজ্ঞেস করার জন্য দোকানে ঢুকতে গিয়েছি তো দোকানদার হাত জোড় করে বলে উঠেছেন 'হুজুর এবারের যাকাতের টাকাটা শেষ হয়ে গেছে, এখন আর হবে না'।

ঙ. গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটি দোকানের ভেতর চেয়ারে বসব চিন্তা করে দরজা ধাক্কা দিয়েছি, অমনি ভেতর থেকে আওয়াজ পেয়েছি, 'ওখানেই থাকেন, ওখানেই থাকেন। ভেতরে আসতে হবে না। বাইরে শিকের মধ্যে আপনার দিয়ে যাওয়া কাগজটা থাকতে পারে। ওটা বের করে ছেলেটার কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে যান'।

এসব কথার আঘাতে আঘাতে শুধু ঘর্মাক্ত হয়েছি। ঠোঁট কামড়ে মাথা নিচু করে বের হয়ে এসেছি। আরো কিছু শোনার আগে আগে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছি। কেউ দেখে ফেলেছে কি না তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করতে করতে কখনো ম্যানহোলের ঢাকনায় হোঁচট খেয়েছি, আর কখনো নর্দমায় পড়ব পড়ব করেও বেঁচে গেছি।

দেওয়ার মত কোন উত্তর তখনও মুখে আসেনি, এখনো যুতসই এমন কোন জবাব পাচ্ছি না যা দিয়ে এ আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারব।

আঘাতটা কোথায় করব?

আমার পক্ষ থেকে পাল্টা যে তীর বের হবে তা কার গায়ে গিয়ে আঘাত করবে? দোকানীর উপর? না কি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কর্ণধারদের উপর? এ এক মহাপরীক্ষার দোলাচলে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি।

সমস্যাটি যদি শুধু আমার মত দু'চার অপদার্থের হত তা হলে এসবের সমাধান একেবারেই সহজ ছিল। এমন কি এর কোন সমাধান না হলেও কোন সমস্যা নেই। আমার মত এক হাজারের দশ হাজারের ব্যাপার হলেও এর সমাধানের কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজার এক্কা গাড়ি আর জুড়ি গাড়ির তুফানে কত অভাগার কত কুঁড়ে ঘর উড়ে গেছে, ধূলায় মিশে গেছে! এতে রাজারই কী সমস্যা? আর রাজ্যেরই কী অসুবিধা?

কিন্তু সমস্যাটি আমার মত অপদার্থদের নয়। এক হাজার দুই হাজারের নয়। সমস্যাটি পুরা উম্মতের। ইলমে ওহির সকল আঙ্গিনার। হামেলে ইলমে ওহির পুরা কাফেলার। হামেলে দ্বীনের পুরা কাফেলার। সিরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত, সঠিক চিন্তা-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'র আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত পুরা কাফেলার। দারুল উলূম দেওবন্দের পরিচয় দানকারী প্রতিটি ব্যক্তির, প্রতিটি তালিবুল ইলমের, প্রত্যেক আলেমের।

এ সমস্যা এক দিনের নয়। এ সমস্যা এক বছর বা এক যুগের নয়। এ সমস্যা শতাব্দীর পর শতাব্দীর। প্রজন্মের পর প্রজন্মের। মুক্তিযোদ্ধাদের চৌদ্দতম অধঃস্তন পুরুষ পর্যন্ত যেমন মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকারদের চৌদ্দতম অধঃস্তন পুরুষ পর্যন্ত যেমন রাজাকার, তেমনিভাবে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের চৌদ্দতম অধঃস্তন পুরুষরাও শতাব্দীর পর শতাব্দী এতিম ও লিল্লাহবোর্ডিংয়ের সদস্য হিসাবে বেঁচে থাকতে হবে।
যদি এ প্রবাহের মুখে কঠিন কোন বাঁধ না দেওয়া হয়।
বিশ্বাস না হলে কিছু বাস্তবতা দেখেছেন। আরো কিছু বাস্তবতা দেখুন।

উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও অসহায়ের প্রতিষ্ঠান বণ্টন

একটি টিভি টকশোর চিত্র এখানে তুলে ধরলে পাঠকদের বুঝতে একটু সহজ হবে। টকশোটির যে অংশের কথা বলছি সে অংশের বক্তা হচ্ছে

নাস্তিক ঘরানার একজন গুরুত্বপূর্ণ মহিলা সদস্য। আর এর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার শ্রোতা হচ্ছেন এমন একজন লোক, যিনি এ মজলিসের একজন আলোচকও।

তাঁর বিশেষণ হচ্ছে, তিনি নিজেকে এবং তাঁর মুরুব্বীরাও তাঁকে ঢাবি শিক্ষক বলে পরিচয় দিতে মুখ রসে ভরে যায়। অপর দিকে তিনি নিজেকে দারুল উলূম দেওবন্দের সচেতন মুখপাত্র কাফেলার গুরুত্বপূর্ণ একজন হিসাবে পরিচয় দিতেও পছন্দ করেন।

এমন এক গুরুত্বপূর্ণ শ্রোতার সামনে এবং তাঁর সমর্থনসূচক মাথা নাড়ানোর সহযোগিতা নিয়ে মহিলা আলোচক খুব দ্বিধাহীন চিত্তে বলে চলেছেন-

'আমাদের দেশের যারা উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে তারা তো নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করে থাকে। এরপর তারা বিদেশ থেকেও উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে থাকে। আর যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তারা দেশের কলেজ, ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়াশোনা করে থাকে। আর মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেরা মাদরাসায় পড়ে। এছাড়া নিম্নবিত্ত, অসহায় দুঃস্থরা সাধারণত বেসরকারী মাদরাসাগুলোতে লেখাপড়া করে থাকে'।

আলোচ্য মহিলা টকশোজীবি বেসরকারী মাদরাসায় পড়ুয়া নিম্নবিত্ত ও অসহায় পরিবারের সন্তানদের লেখাপড়ার অবস্থা এবং তাদের আচার আচরণের অবস্থার উপর নিজের আশ্চর্যবোধ প্রকাশ করতে গিয়ে এও বললেন যে, 'এরা জানি কেমন? এরা শিক্ষার মূল ধারার সঙ্গে মিলতে পারছে না। পোষাকে আশাকে কেমন আলখেল্লা ধরনের পোশাক পরে। আবার মূল ধারার শিক্ষার অভাবে তারা দিন দিন জঙ্গি ভাবাপন্ন হয়ে যায়। এদেরকে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা চাই'।

এ কথাগুলোর উপরও আমাদের আলোচ্য মুখপাত্র হওয়ার দাবিদার সাহেব খুব মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন। এরপর তিনি তাঁর নিজের বক্তব্যে সোনায় যে সোহাগা ঢেলেছেন তা আপাতত আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই আমি এখন সে দিকে যাচ্ছি না।

এ দৃশ্য থেকে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, দেশের মানুষের স্তরবিন্যাস এবং সে স্তরভেদে তার শিক্ষা কেন্দ্রের বিন্যাস।

বক্তব্যটি একজন ইসলামবিদ্বেষীর। সে যেকোনভাবেই চাইবে, ইসলামকে এবং ইসলামের শিক্ষাকে হেয় করতে। এ কথা আমি স্বীকার

করি। কিন্তু যে কথাটি আমি স্বীকার করতে রাজি নই তা হচ্ছে, সাধারণ মানুষ তার এ কথা গ্রহণ করেছে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে।

জনগণ তার এ ভাষ্য কেন গ্রহণ করেছে? তারা কি এ জন্য গ্রহণ করেছে যে, তারা সবাই ইসলাম বিদ্বেষী? না কি তারা এ জন্য গ্রহণ করেছে যে, এ কথা গ্রহণ করার মত কিছু ব্যবস্থা ও আয়োজন আমরা আগে থেকেই করে রেখেছি।

প্রশ্ন আসতে পারে মানুষ তার এ কথা গ্রহণ করেছে এর কী প্রমাণ রয়েছে? তার কথা সে বলেছে, তার সমর্থক প্রচারমাধ্যম তা প্রচার করেছে। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, সাধারন মানুষ তার এ কথা গ্রহণ করেছে এবং মেনে নিয়েছে।

এ প্রশ্ন প্রসঙ্গে আমার কয়েকটি নিবেদন:

এক. প্রথম নিবেদন হচ্ছে, এ কথা তার একার কথা নয়। এক হাজারের কথা, এক লক্ষের কথা, এক কোটির কথা। ওরা এমন কথা বলছে, আর সঙ্গে উদাহরণ দেখিয়ে দিচ্ছে বাস্তবতা থেকে।

একটু বুকে হাত দিয়ে বলুন, দেশে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে যে পরিমাণ মাদরাসা-জামেয়া ও দারুল উলূম আছে সে পরিমাণ হিসাবে একজন নাস্তিক তার এ দাবির পক্ষে প্রমাণ দেওয়ার জন্য কত কিলোমিটার চলতে হবে? প্রতি দুই-চার-পাঁচ কিলোমিটার পর পর কি সে দেখাতে পারবে না যে, এই যে, দেখুন এটি একটি এতিমখানা, এটি একটি লিল্লাহবোর্ডিং। এগুলোতে কুরআন হাদীস শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

বলুন, এটা কি খুব কঠিন বিষয়?

সে দেখানোর পর আপনি তাকে কী বলবেন? হয়তো স্বীকার করে নেবেন, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগত শিক্ষার্থীরা সবাই বা অধিকাংশ এতিম অসহায় মিসকীন এবং তারা সমাজের তৃতীয় শ্রেণির লোক। যাদের কোন সহায় সম্বল নেই তারাই ধর্মীয় শিক্ষা শিখতে আসে।

আর যদি এ কথা স্বীকার না করেন তাহলে কী বলবেন?

বলবেন, না! এগুলোর নাম রাখা হয়েছে এতিমখানা। বাস্তবে এখানে কোন এতিম নেই, বা থাকলে দু'চার জন আছে। আসলে এগুলোতে সর্বস্তরের সকল ঘরের সন্তানরাই পড়াশোনা করতে আসে। এমনিভাবে লিল্লাহবোর্ডিং -এর ব্যাপারে বলবেন, এটার নাম রাখা হয়েছে লিল্লাহবোর্ডিং। আসলে এগুলো লিল্লাহবোর্ডিং নয়। এখানে কেউ বিনামূল্যে

খানা খায় না। আর খেলেও দু'চার জন। বাকিরা সবাই বা অধিকাংশই টাকা দিয়ে খায়।

এখন আপনিই চিন্তা করুন, কোন উত্তরটি আপনার জন্য বেশি নিরাপদ। প্রথমটি না দ্বিতীয়টি? এরপর এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং -এর ফযীলত যত পারেন বয়ান করতে থাকুন।

দুই. এ কথা শুধু নাস্তিকের কথা নয়। আস্তিকের কথা। মুসলমানের কথা। দুনিয়াদার মুসলমানের কথা। দ্বীনদার মুসলমানের কথা। মাদরাসা-জামেয়ার শুভাকাঙ্ক্ষীদের কথা। মাদরাসা-জামেয়ার জন্য যারা নিবেদিত প্রাণ হিসাবে সমাদৃতি লাভ করে ফেলেছে তাদেরও কথা।

আমাদের বিচারে সমাজের কোন শ্রেণিটি ইলমে দ্বীন ও ইলমে ওহির সবচাইতে বেশি খায়েরখাহ-শুভাকাঙ্ক্ষী? আশা করি খুব সহজেই উত্তর পাব এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং-মাদরাসা-জামেয়া-দারুল উলূমের যারা সভাপতি, সাধারন সম্পাদক ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ। এমনিভাবে বদরী সদস্য, ওহুদী সদস্য, হুদায়বিয়া সদস্য, জঙ্গে আহযাব সদস্য ও বিদায়হজ্জের ভাষণের শ্রোতা সদস্য -এরাই তো।

ব্যক্তিবিশেষের বিচারে কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রমও হবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সামষ্টিকভাবে এ কাফেলাগুলো এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং-মাদরাসা-জামেয়া-দারুল উলূম ইত্যাদির সবচাইতে কাছের মানুষ, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সমাজের সবচাইতে দ্বীনদার শ্রেণি।

এদের ব্যাপারে আমাদের কী ধারণা? তারা আমাদের কী মনে করে? ইলমে দ্বীন হামেলে দ্বীনের কাফেলাকে তারা কী মনে করে? কত নম্বর নাগরিক মনে করে? এই সর্বশ্রেষ্ঠ কাফেলার মুখোমুখী হয়ে আমরা প্রতিদিন কী দেখতে পাই? সে দৃশ্যগুলোও কি এখন আবার লিখে, চিত্র অঙ্কন করে, ভিডিও চিত্র ধারণ করে, ছবি তুলে দেখাতে হবে?

আমি সে চিত্র এখানে আর আঁকবো না। আঁকলে পাঠকদের জন্য বুঝতে সহজ হতো, কিন্তু আমার বিপদের মাত্রা একটু বেড়ে যাবে। তাই ভিন্নভাবে দু'টি কথা বলি, যা থেকে পাঠক অনুভব করতে পারবেন, আমাদের বিচারে যারা সমাজের সবচাইতে বড় দ্বীনদার এবং আহলে ইলমের সবচাইতে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী তারা এ ইলম, এ ইলমের ধারক-বাহক এবং এ ইলমের আঙ্গিনাগুলোকে কী মনে করে? কোনভাবে মূল্যায়ন করে?

প্রথম কথাটি হচ্ছে, সমাজের এই সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনদার শ্রেণির শতকরা কত ভাগ তাদের সন্তানদেরকে আমাদের এ শিক্ষালয়গুলোতে পড়ান? যে শিক্ষালয়ে না পড়ে দু'পায়ের সবাক প্রাণীটি পশুর কাতার থেকে মানুষের কাতারে আসা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, এ সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনদার শ্রেণিটি মাদরাসা-জামেয়া ও দারুল উলুমের অঙ্গন থেকে শতকরা কত ভাগ শিক্ষা গ্রহণ করার মানসিকতা পোষণ করেন? মাদরাসার অঙ্গন থেকে কত ভাগ শিক্ষা ঘর ও সমাজের অঙ্গনে প্রয়োগ করার প্রয়োজন অনুভব করেন? আর সমাজের কত ভাগ অনাচার ও বদদ্বীনীকে মাদরাসার অঙ্গনে প্রয়োগ করার মানসিকতা পোষণ করেন?

আমাদের কাছে তো নগদ এমন কারগুজারী আছে, যেখানে সমাজের দ্বীনদার শ্রেণি মাদরাসার শুভাকাঙ্ক্ষী সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষেরা দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের হামেলদেরকে কুফরী শক্তির বিশ্বগুরুর দরবারে গিয়ে তাকে কুর্ণিশ করতে বাধ্য করেছেন।

কুরআনের ভাষায় যারা 'মাগযূব আলাইহিম', 'দ্ব-ললীন' ও 'নাজাস' তাদেরকে শুভেচ্ছো জানাতে বাধ্য করা হয়েছে কুরআনের ধারক-বাহকদেরকে এবং কুরআনের বিশ্বাসীকে। এসব দেখে বোঝার মত যোগ্যতা কি আমাদের হয়নি? এতটুকু যোগ্যতা না থাকলে নিজেকে আর মানুষ বলে সুস্থ হিসাবে পরিচয় দেওয়ার দরকার কী?

কারগুজারীতো আমার কাছে আলহামদু লিল্লাহ অনেক আছে। কিন্তু আমি কারগুজারী শুনালে তা নাস্তিকরা জেনে ফেলে এবং ইসলাম ও আহলে ইলমের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ পেয়ে যায়। -এমন মন্তব্য মুরুব্বীরা ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। কিন্তু, আমার জানা ছিল না যে, এসব তথ্যের জন্য নাস্তিকরা যুগ যুগ ধরে আমার লেখা ও বইয়ের অপেক্ষায়ই বসে আছে। ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা।

যাই হোক বলছিলাম, নাস্তিকতো তার মতলবেই কথা বলেছে। এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। কিন্তু, এ ধারণাটি শুধু নাস্তিকের নয় আস্তিকেরও, মুসলমানেরও, দ্বীনদারেরও, ইলম ও আহলে ইলমকে যারা ভালোবাসে বলে দাবি করে তাদেরও।

একটি দৈনিকের আহলে ইলমপ্রীতি (?)

আরেকটি দৃশ্যও মনে পড়ে গেল। ধর্মীয় কোন বিষয়ে ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকগণ আন্দোলন শিরোনামে কিছু একটা করেছিল। যা করেছিল তাতে মহারাজা-ওজির-নাজিরবৃন্দ খুব বেশি রকমের নারাজ হয়ে গিয়েছিলেন। নারাজ হয়ে আন্দোলনকারীদেরকে আচ্ছা রকমের ধোলাইতো দিয়েছেনই, উপরন্তু তাদের উপর বিভিন্ন রকমের অভিযোগ উত্থাপন করে শুধু গালাগালি করেই ক্ষান্ত হননি, তাদের হাতে পায়ে অদৃশ্য শিকল লাগিয়ে দিয়ে গৃহবন্দির মত করে দিয়েছে।

যাই হোক, রাজা-মহারাজা কী করেছেন তা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। এমন অনেক কিছুই তাদেরকে করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে রাজকীয় বিষয়। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, আহলে ইলমের পক্ষ থেকে সাফাই গেয়ে একটি দৈনিক পত্রিকা যে প্রতিবেদন তৈরি করেছে সে প্রতিবেদনটি। সে প্রতিবেদনের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের একটি যোগসূত্র আছে। প্রতিবেদনটি অনেক দীর্ঘ। আমি তার ভাবার্থ ও সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি-

"ওলামায়ে কেরাম ও মাদরাসার ছাত্রদের উপর যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এসব অভিযোগ কীভাবে উত্থাপন করা যেতে পারে? এদের দ্বারা কখনো এমন কাজ সম্ভব নয়। কারণ; এরা হচ্ছে সমাজের একেবারে নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। দুনিয়ার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা আখেরাতমুখী কিছু মানুষ যারা রাত দিন শুধু কুরআন হাদীস নিয়ে পড়ে থাকে। সাধারণ পরিবারের মানুষ। জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা ও অনুদানে তারা চলে। তাদের উপর যেসকল অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো এমন গরীব এতিম অসহায় মানুষদের দ্বারা সম্ভব নয়। কুরবানীর চামড়া, ধানের চাঁদা, পাটের চাঁদা, বাঁশের চাঁদা, মুঠো চাল ও ধনাঢ্যদের দান দক্ষিণায় তারা চলে। এমন কিছু নিরীহ সাদা-মাটা, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষের উপর এত বড় অভিযোগ কোনভাবেই মানা যায় না"।

পত্রিকা তার ধর্মীয় দায়িত্বের সবটুকু আদায় করতে পেরে খুব প্রশান্তি লাভ করল। অভিযোগ আমাদের মাথা থেকে সরে যেতে থাকল, আর আমরা ধীরে ধীরে গর্তের মধ্যে ঢুকতেই থাকলাম। গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠতে থাকল।

এখান থেকে আমরা আমাদের কী চিত্র পেলাম? কেন পেলাম? আমরা কি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ঘোষণার বিপরীতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল মুনাফিকের কথাই সাদরে গ্রহণ করব?

﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ **(سورة المنافقون:٨)**

মুনাফিক সর্দার যাদেরকে ইজ্জতওয়ালা বলেছিল আমরা কি তাদেরকেই ইজ্জত ওয়ালা বলব? আর মুনাফিক সর্দার যাদেরকে যিল্লতওয়ালা বলেছিল আমরা কি তাদেরকেই যিল্লতওয়ালা বলব? আমরা প্রীতিতে মজে গিয়ে নিজেদের হাকীকত বিকৃত করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি।

উল্লেখ্য, পত্রিকাটির ব্যাপারে প্রায় সবারই ধারণা, এটি একটি ইসলাম ও আহলে ইলমবান্ধব পত্রিকা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ওলামায়ে কেরাম পত্রিকাটিকে আপন মনে করে অনেক আশা ভরসা করে থাকে।

এখানেও অনেকে জবাব দিয়ে ফেলবেন, সাময়িক পিঠ বাঁচানোর জন্য এভাবে বলা হয়েছে। এতে এমন দোষের কী আছে?

আমার খেয়াল, এখানে দোষের অনেক কিছু আছে। একটি দোষের বিষয় হচ্ছে, সাময়িক সুবিধার জন্য পরিচয় বদলে দেওয়া যায় না, হাকীকত পরিবর্তন করে ফেলা যায় না। এর কোন বৈধতা নেই। দ্বিতীয়ত দোষের বিষয় হচ্ছে, আমাদের এ সাময়িক অবস্থার কোন ইতি রেখা নেই। সাময়িক অবস্থার বয়সই এখন শত বছর। এ সাময়িক অবস্থাকে আর কত শত বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করার খেয়াল আপনারা করেছেন? আর রাজা-মহারাাজদের অভিযোগ খণ্ডানোর মত বলিষ্ঠ কোন ব্যবস্থা আমাদের কাছে নেই? না থাকলে চুপ থাকব, বিকৃত করব না।

তিন. কথাটি উপস্থাপিত হয়েছে, মাদরাসা-জামেয়ার মুখপাত্র হওয়ার দাবিদারদের সামনে। তাদের সমর্থনসূচক মাথা দোলানোর যোগানে। শুনতে শুনতে জি, হ্যাঁ, তথাস্তু, বটে ইত্যাদি শব্দের সমর্থনে।

নাস্তিক যখন অবলীলাক্রমে তার মন্তব্য করে চলেছে তখন যে পোশাক পরা লোকটি তার প্রতিটি কথা সমর্থন করে চলেছে সে পোশাক আমাদের সবার পোশাক। সে কথা বলছে আমাদের ভাষায়। সে উদ্ধৃতি দিচ্ছে আমাদের। দারুল উলূম দেওবন্দের। সে তার আলোচনায় টেনে আনছে আমাদের বিশিষ্টজনকে।

এমতাবস্থায় এ কথা বলা যায় না যে, নাস্তিকের কথা নাস্তিকই শুনেছে। তা আমাদেরকে স্পর্শ করেনি। অবশ্যই স্পর্শ করেছে। আমরা দ্বীনের কোন প্রসঙ্গে বা ইলমের কোন প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে এ দৃশ্য ও চিত্রগুলোর

আলোকেই বাধার সম্মুখীন হই। অজপাড়াগাঁর মানুষদের মুখেও এসব দৃশ্যের উদ্ধৃতি শুনতে পাওয়া যায়।

এ ধরনের বাক্যগুলো প্রায়ই শোনা যায়: 'সেখানে তো আপনারাও ছিলেন'। 'তখনতো আপনাদের লোকও সামনে ছিল'। 'তখন তো আপনারা কিছু বললেন না'। 'তিনিও তো দেওবন্দী আলেম'। 'তিনি কি আপনার চাইতে ছোট আলেম না কি'। 'আপনি কে? আপনার চাইতে বহু বড় হুজুররাই এটা মেনে নিয়েছে'। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব মানতে হবে, চোখ বন্ধ করে নিজেকে আড়াল করার সব রাস্তা বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

চার. নাস্তিক ও আস্তিকের কর্ণধার (?) -এ দুয়ের সমন্বিত দৃশ্য প্রচারিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী। লক্ষ-কোটি শ্রোতা দর্শকের সামনে। বিষয়গুলো ভূখণ্ডবিশেষের মাঝেও আবদ্ধ রয়নি। আমাদের এ অন্যায়ের শিকার হতে হবে, এ সীমান্তের বাইরের আরো বহু মুসলামানের। আহলে ইলমের। দ্বীনের ধারক-বাহকদের।

এ দৃশ্য এমন দূরেও পৌঁছে যাবে এবং ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে যে দূরের মানুষগুলো কখনো জানতে পারবে না, এ আলোচক কে? আর এ শ্রোতা কে? তারা শুধু জানতে পারবে, দ্বীন, ইলমে দ্বীন, দ্বীনের ধারক-বাহক এবং ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকদের অবস্থা এখন এই। এর জন্য বিশেষ কোন গোষ্ঠী দায়ী না কি সবাই দায়ী তাও তারা কখনো জানতে পারবে না।

পাঁচ. আস্তিকের সেই কর্ণধার (?) আর আমাদের মেকাপে ও অবয়বে কোন পার্থক্য নেই। থাকলেও সে পার্থক্য বোঝার মত শ্রোতা-দর্শক টিভির পর্দার সামনে বসে না। যারা বসে তারা এ পার্থক্য বোঝার কথা নয়।

দুঃখজনক সারসংক্ষেপ

অতএব সারকথা দাঁড়াল, এ দেশের মানুষের মনে এ বিশ্বাস প্রোথিত করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে যে, উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তানদের জন্য ইলম শিক্ষা করা ফরয ও অপরিহার্য কোন বিষয় নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের জন্যও ইলমে দ্বীন ও ইলমে ওহি শিক্ষা করা ফরয কোন দায়িত্ব নয়। এমনিভাবে নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্যদের জন্যও এটা ফরয নয়। তাই তাদের সঙ্গে এ ইলমের কোন সম্পর্কও নেই।

এ ইলমের সম্পর্ক হচ্ছে নিম্নবিত্তের কিছু অসহায়, এতিম, ছিন্নমূল, সম্বলহীনদের অনন্যোপায় একটি পথ হচ্ছে ইলমে দ্বীন তথা কুরআন হাদীসের ইলম শিক্ষা করা। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এটাও কোন ফরয দায়িত্ব হিসাবে নয়। এটা হচ্ছে, তারা যেহেতু সামর্থ্য না থাকার কারণে মূল ধারার জ্ঞানের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারছে না, তাই একটা কিছু করা উচিত হিসাবে তা করে চলেছে। সে জন্য বিষয়গুলোর শিরোনামও দেওয়া হয়েছে ঐচ্ছিক বিষয়। যা করলেও সমস্যা নেই, না করলেও সমস্যা নেই। তবে প্রায়োগিক পদ্ধতিটা এমন রাখা হয়েছে যার ফলাফল দাঁড়ায়, না করলে ভালো।

করুণা! করুণ!!

এ লেখাটি আমি যখন লিখছি তার সর্বোচ্চ ত্রিশ/বত্রিশ ঘন্টা আগে শোনা একটি বাক্যও পাঠককে শুনিয়ে দেই। বাক্যটি যিনি বলছিলেন তিনি অত্যন্ত তৃপ্তি এবং প্রশংসার বাণী হিসাবে শোনাচ্ছিলেন। আমি একজন সংকীর্ণমনা মানুষ হওয়ার কারণে কথাটি আমার কলিজায় শেলের মত বিঁধেছে। তিনি বলেছেন-

'সরকার তো এখন কওমী মাদরাসাকেও অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীতো নিজেই বলেছেন, 'তারাও তো মানুষ'।

তার এই 'তারাও তো মানুষ' বাক্যটি সদ্য শান দেওয়া একটি তীরের ফলার মত আমার কলিজায় আঘাত করেছে। কিন্তু আমি জানি, আমাদের অনেকের কাছেই আজ এ ধরনের বাক্য অনেক উপাদেয়। অনেক উৎসাহব্যঞ্জক। অনেক মামদূহ। যেন উচ্চবর্ণ হিন্দু ব্রাম্মণের অপার অনুগ্রহ ও বদান্যতা ঝরে পড়ছে নিম্ন বর্ণের হিন্দু শূদ্রের উপর। মানুষ বলে কোলে টেনে নেয়ার দয়া স্নেহের আবেশে প্রভুতে-গোলামে একাকার অবস্থা।

যার মুখ দিয়ে কথাটি বের হয়েছে তার বিভিন্ন পরিচয়ের সাথে সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হচ্ছে, তিনি একজন বিশিষ্ট সফল গরু ব্যবসায়ী। সে সফলতার অনেক গল্পও তিনি এর মধ্যে আমার সঙ্গে করে ফেলেছেন। আবার তিনি নেত্রীর ভৃত্যদের আস্থাভাজন -এ কথাও তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেছেন। সুতরাং-

এমন একজন ব্যক্তির মুখে এমন একটি বাক্য শুনে আমি স্বাভাবিকও থাকতে পারতাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা আমি পারিনি। পরে তা স্বাভাবিক করে নিয়েছি আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা কল্পনা করে।

অর্থাৎ একই কথা যদি আমাকে শুনতে হয় দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকদের কর্ণধারদেরও কর্ণধার হওয়ার দাবিদারদের মুখে। আর কথাটি বলার সময় যদি তাদের মুখগুলো আরো বেশি রসে ভরে যায় তখন আমি ও আমার মত এতিমদের কী অবস্থা হবে! ভাবতেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে!

এবার আমরা আরো কিছু তথ্যের মুখোমুখী হওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

এতিমের সংজ্ঞা

এতিম একটি শরয়ী পরিভাষা। কুরআন, হাদীস ও ফিকহের কিতাবাদিতে পরিভাষাটির পরিচয়সহ ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বিষয়গুলো অনেক পুরাতন, অনেক স্পষ্ট, সর্বসমাদৃত। আমরা অতি সংক্ষেপে দু'চারটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি শুধু এ আশঙ্কায় যে, আরো বহু স্পষ্ট ও স্বীকৃত বিষয়ের মত এ পরিভাষার উপরও কোন ধূলা-বালু পড়ে আছে কি না?

এছাড়াও দ্বীনের প্রত্যেকটি পরিভাষা, প্রত্যেকটি আমল এবং প্রত্যেকটি আকীদা বিশ্বাসকে যদি প্রতিদিন বা কমপক্ষে কিছু দিন পর পর নাড়া চাড়া না দেওয়া হয় তাহলে বেশি স্পষ্ট ও বেশি স্বীকৃত হওয়ার কারণে মানুষ তা মনে রাখার চেষ্টা করে না। এক সময় এমন হয় যে, মানুষ তা ভুলে যায়। এরপর একটা পর্ব এমনও আসে যখন কেউ কেউ তা অস্বীকার করতে শুরু করে।

দ্বীনের সাতাত্তর শাখার অনেক শাখাই এখন এ পরিস্থিতির শিকার। এমনিভাবে দৈনন্দিন অনেক ফরয বিধান এভাবে লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। তাই এতিমের সংজ্ঞা অনেক বেশি স্পষ্ট ও স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও অতি সংক্ষিপ্ত কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি।

কুরআন থেকে-

﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ (سورة النساء:٢)

{وَآتُوا الْيَتَامَى} الصِّغَار الَّذِينَ لَا أَب لَهُمْ {أَمْوَالهمْ} إذَا بَلَغُوا. (تفسير الجلالين)

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (سورة النساء: ٦)

{وَابْتَلُوا} اخْتَبِرُوا {الْيَتَامَى} قَبْل الْبُلُوغ فِي دِينهمْ وَتَصَرُّفهمْ فِي أَحْوَالهمْ {حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاح} أَيْ صَارُوا أَهْلًا لَهُ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ السِّنّ وَهُوَ اسْتِكْمَال خَمْس عَشْرَة سَنَة عِنْد الشَّافِعِيّ. (تفسير الجلالين)

ويدل على أن اليتم اسم يقع على الصغير الذي قد مات أبوه دون الكبير قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد حلم" وقد قيل إن كل ولد يتيم من قبل أمه إلا الإنسان فإن يتمه من قبل أبيه (أحكام القرآن للجصاص، باب بعد قسمة الخمس)

হাদীস থেকে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ.. (مسند أبي يعلى الموصلي)

ফিকহ থেকে-

وكتبت تسألني عن اليتيم متى يخرج من اليتم؟ فإذا احتلم يخرج من اليتم ويضرب له بسهم، وهذا لقول النبي –صلى الله عليه وسلم– «لا يتم بعد الحلم» والذي روي أن الكفار كانوا يسمون رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يتيم أبي طالب بعد المبعث، قد كانوا يقصدون الاستخفاف به لا أنه في الحال يتيم. (المبسوط للسرخسي، باب معاملة الجيش مع الكفار)

عَرَّفَ الْفُقَهَاءُ الْيَتِيمَ بِأَنَّهُ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ دُونُ الْبُلُوغِ. لِحَدِيثِ: "لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ". (الموسوعة الفقهية الكويتية)

واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم. قال صلى الله عليه وسلم "لا يتم بعد البلوغ ". (رد المحتار، باب الوصية للأقارب وغيرهم).

উদ্ধৃত আয়াত, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের এবারত থেকে এতিমের সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পেলাম তার সারমর্ম হচ্ছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এতিম শব্দটি ব্যবহার করার জন্য তার মাঝে দু'টি অবস্থা বিরাজ করা জরুরী।

এক. তার পিতা মারা যাওয়া। দুই. সে নাবালেগ-অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। দু'টির যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে আর এতিম বলা যাবে না এবং এতিমের বিধানাবলী তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

আর এ এতিমও যদি অসহায় না হয়ে সচ্ছল হয় তাহলে তার ক্ষেত্রেও এতিমের এমন কিছু বিধান প্রযোজ্য হবে না যা অসহায় এতিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বিস্তারিত ফিকহের কিতাবাদিতে দেখুন।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ সংজ্ঞা জানার সমস্যা ও না জানার সমস্যা

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি যারা গ্রহণ করেছেন এবং করার ফযীলত বয়ান করার পক্ষে -তাঁরা পরিভাষাটির উপরোক্ত সংজ্ঞা সম্পর্কে না জানলে এক ধরনের সমস্যা। আর জানলে আরেক ধরনের সমস্যা। কোন সমস্যাটি বড়, আর কোন সমস্যা ছোট তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। আমরা শুধু দু'দিকের সমস্যাগুলো তুলে ধরব। গ্রহণ বর্জনের এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

না জানলে সমস্যা হচ্ছে, প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী যেসব মাদরাসা, দারুল উলূম ও জামেয়া এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে চলছে সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, উপদেষ্টামণ্ডলী ও শুভাকাঙ্ক্ষীর যে কাফেলা রয়েছে, সে কাফেলা মানে ও পরিমাণে এবং কোয়ালিটি ও কোয়ান্টিটিতে এত বেশি বড় যাদের ব্যাপারে এ বিষয়ে না জানার দাবি করা কোনভাবেই বৈধ নয়, কোনভাবেই সম্ভব নয়।

যে এমন খারাপ ধারণা করবে সে যেমনিভাবে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ বিশাল কাফেলার উপর জুলুম করল, তেমনিভাবে সে এ অমূলক ধারণার কারণে নিজের সত্তার উপরও জুলুম করল। কারণ এর সংখ্যা এখন, এক-দুই নয়, এক শত দুই শতও নয়, এক হাজার দুই হাজারও নয়। এর সংখ্যা এখন লক্ষ পেরিয়ে আরো ভয়াবহ কোন অংকের দিকে এগিয়ে চলেছে। এতো হচ্ছে পরিমাণ। আর মান?!

মানের বিষয়ে বলা যায়, প্রবহমান পৃথিবীতে ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকগণের জন্য সর্বোচ্চ মানের যে বিশেষণগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে তার

প্রত্যেকটি ব্যবহার হওয়ার মত যোগ্য ও যথাযোগ্য ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব এ কাফেলায় রয়েছে। সমাদৃতি ও গ্রহণযোগ্যতার পরিচায়ক যত পরিভাষার ব্যবহার বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে তার প্রত্যেকটি ব্যবহার করার মত ব্যক্তি এ কাফেলার মাঝে রয়েছে।

তাই মানে ও পরিমাণে কেউ এ কাফেলার সঙ্গে টক্কর দিতে আসা মানে সে নিজের মাথা কুরবান করতে এসেছে। তাকে আমরা আবদার করে বলতে পারি-

يا ناطح الجبل أشفق على رأسك ولا تشفق على الجبل

তবে সংশ্লিষ্টদের মান ও পরিমাণের ভয়াবহতার কারণে অমূলক বস্তু মূলকে পরিণত হবে -এ ধরনের আশা করার সুযোগ পৃথিবীর এ শেষ প্রান্তে এসে আর নেই।

অতএব এতিমের এ সংজ্ঞা তাঁরা জনেন না এটা ধারণা করার অর্থ হচ্ছে, মানে পরিমাণে সমৃদ্ধ ইলমে দ্বীনের একটি বিশাল কাফেলাকে অজ্ঞতার দোষে দুষ্ট বলে অখ্যা দেওয়া। এটা হচ্ছে, না জানার সমস্যা।

আর জানার সমস্যা হচ্ছে, মানে ও পরিমাণে সমৃদ্ধ এত বিশাল একটি কাফেলা এতিম পরিভাষাটির পরিচয় ও বিধানাবলী জানার পরও এটিকে কোথায় ব্যবহার করছেন? যাদের জন্য ব্যবহার করছেন তাদের জন্য এ পরিভাষাটি ব্যবহার করা যায় কি না? যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য এমন পরিভাষা ব্যবহার করা যায় কি না?

এ শিরোনামের প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই তো উম্মতের লক্ষ লক্ষ সমস্যার শরয়ী সমাধান সম্বলিত ফাতওয়া প্রচার ও প্রসার করা হচ্ছে। এ শিরোনামের প্রতিষ্ঠানগুলোতেই তো এ বিষয়ক হাজার হাজার মাসআলা পঠিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে তো এ বিষয়ক হাজার হাজার প্রশ্নোত্তর হচ্ছে।

কিন্তু, আমাদের আজকের আলোচ্য মাসআলা অর্থাৎ, যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং যাদের জন্য পরিভাষাটি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যুগের পর যুগের পর যুগের পর যুগ ব্যবহার করেই চলেছি, সেই প্রতিষ্ঠান ও সেই ব্যক্তিদের জন্য এ পরিভাষার ব্যবহার কতটুকু বৈধ আর কতটুকু অবৈধ -এ বিষয়ে কী পরিমাণ ইস্তিফতা ও কী পরিমাণ প্রশ্ন দারুল ইফতাগুলোতে জমা হয়েছে? কী পরিমাণ ইস্তিফতার সুস্পষ্ট উত্তর এসেছে? কী পরিমাণ উত্তরের উপর আমল চলছে। এসব কিছুর একটি জরিপ হওয়ার মত সময় কি এখনো হয়নি?

আমরা যারা সন্দেহবাদি তাদেরতো সন্দেহ, এর প্রসার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর ফযীলতের বয়ানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ মাসআলা অস্পষ্ট করার প্রবণতাও বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় প্রজন্ম যদি এটাই বুঝে বসে যে, যা কিছু চলছে সব জেনে শুনেই চলছে, তাহলে এটি একটি অশুভ ও অশনি সংকেত। সুতরাং সমস্যা দু'দিকেই।

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة * وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

এতিমখানার সঙ্গে এতিমের সংজ্ঞার মিল-অমিল

এটাও কোন আলোচনার মাধ্যমে বই লিখে মানুষদেরকে জানাতে হবে এমন বিষয় নয়। বরং বইয়ে লিখলে লেখকের বদনাম হয় যে, তিনি গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। যে তথ্য কোটি কোটি মানুষ জানে তা লিখলে ফাঁস হয়ে যায় -এ তথ্যটিও আমার তথ্যের ঝুলিতে নতুন করে জমা হল।

সমস্যা সামাধানের পথ খুঁজতে আমাদের আলোচনায় সমস্যা উঠে আসে। যে তথ্য প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লক্ষ লক্ষ সদস্যের মুখে, মাইকে, প্রচার পত্রে, নথিপত্রে, ফযীলতের বয়ানে প্রচার হচ্ছে, সে তথ্য বই লিখে আমরা নতুন করে বদনামের বোঝা বাড়ানোর প্রয়োজন কী? আমরা তো সমস্যার কথা বলতে চাই।

কর্তৃপক্ষের অকপট স্বীকারোক্তি আছে, প্রকাশ্য বলাবলি আছে, 'আমাদের এতিমখানার ছাত্রসংখ্যা ২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) এদের মধ্যে দু'জন এতিম আছে, আর গরিব অসহায় ছাত্র আছে কিছু, আর বাকিরা মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান'। 'আমাদের লিল্লাহবোর্ডিং -এ সাড়ে পাঁচ শত ছাত্র খানা খায়। এদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ/পঞ্চাশজন হবে এতিম অসহায়'।

এ কথাগুলো দু'একটি এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের নয়। এ ভাষা দেশের সকল এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং কর্তৃপক্ষের। মাফ করবেন, আমি 'সকল' বলে ফেলেছি। আমার জানার বাইরে থাকতেও পারে। কিন্তু আমার দেখা ও শোনার মধ্যে ব্যতিক্রম নেই বলেই আমি 'সকল' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

এরপর এতিম ও অসহায়ের যে সংখ্যা বলা হয়ে থাকে সে এতিম ও অসহায় কেমন এতিম ও অসহায় তা পূর্বে উল্লেখকৃত সংজ্ঞার সঙ্গে মিলালে আরো বহু জটিলতা সৃষ্টি হবে। জটিলতা কমার কোন সম্ভাবনা নেই।

এমতাবস্থায় এতিমের সংজ্ঞার সঙ্গে এতিমখানার এতিমদের মিল-অমিল না খুঁজে এভাবে নির্দ্বিধায় চলতে থাকা এবং চলতে দেওয়ার ক্ষেত্রে কি শরীয়তের কোন বিধি নিষেধ নেই? এ ক্ষেত্রে যে অসত্যগুলোর আশ্রয় নিতে হয় সেগুলোর ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? দাতাগোষ্ঠী এ হাকীকত জানলে এর বিধান কী? এবং না জানলে এর বিধান কী? এ বিষয়ক যিম্মাদারী কার?

কর্তৃপক্ষ, কর্ণধার ও মুফতী

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষতো দ্বীনের স্বার্থে এসব বিষয়কে বৈধতা দিয়ে চলেছে। এমতাবস্থায় কর্ণধারদের দায়িত্ব কী? দারুল ইফতাগুলোর দায়িত্ব কী? এ বিষয়ে কেউ ইস্তিফতা করলে দায়িত্ব কী? আর কেউ ইস্তিফতা না করলে দায়িত্ব কী?

কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি শরীয়তের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে -এ অজুহাতে অনেকে এ বিষয়গুলোর বৈধতা নিজে নিজেই নিশ্চিত করে নিচ্ছে।

এমতাবস্থায় কর্ণধারগণের দায়িত্বে এ কথা আসে কি না যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে শরীয়ত সত্যকে এড়িয়ে যেতে বলার সঠিক মর্ম কী, যেসব ক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে সে ক্ষেত্রগুলো কী এবং এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে যত সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে সেগুলো অনুমোদিতের তালিকায় আছে কি না? অনুমোদিতের তালিকায় যা যা আছে সেগুলোর প্রায়োগিক পদ্ধতি কী এবং তা কার জন্য?

অত্যাধুনিক গালি

এতসব বিষয়কে আড়ালে রেখেই আমরা দ্বীনের নামে এত কাণ্ড করে চলেছি?! অথচ আজ গালি দেওয়া হচ্ছে সে মানুষগুলোকে যারা কিতাব ঘেটে ঘেটে, তথ্য সংগ্রহ করে করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে মত বিনিময় করে করে নিজের উপর ফরয দায়িত্বগুলো বুঝে নেয়ার চেষ্টা করছে এবং বাস্তবায়নের পথ খুঁজে চলেছে।

গালি দেওয়া হচ্ছে 'যন্ত্র আর গ্রন্থের অনুসারী' বলে। এ গালি আজ যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এটা কি শুধু তাদেরই প্রাপ্য, না কি যারা দিচ্ছে তাদেরও এর মাঝে অধিকার রয়েছে। সময় একদিন কথা বলবে

ইনশাআল্লাহ। সময়ের যবান যেদিন খুলবে সেদিন আর যন্ত্রেরও প্রয়োজন হবে না, গ্রন্থেরও প্রয়োজন হবে না এবং আকাবিরেরও প্রয়োজন হবে না।

সময় একদিন এ কথাও বলবে যে, 'যন্ত্র' আর 'গ্রন্থ' ছাড়া এতদিন গালিদাতাগণ কী দিয়ে কথা বলেছেন? এখন কী দিয়ে বলছেন? এবং ভবিষ্যতে কী দিয়ে বলবেন?

আমরা মানুষগুলো ছোট হওয়ার কারণে আমাদের কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ফাতওয়ার আদি থেকে অন্ত সকল কিতাবের নাম হয়ে গেছে 'গ্রন্থ'। অর্থাৎ নসীম হিজাযী ও সফীউদ্দীন সরদারের উপন্যাসের মত কিছু একটা।

আমাদের প্রতিদিনের চাক্ষুষ তথ্যভাণ্ডারগুলোর নাম হয়ে গেছে 'যন্ত্র'। অর্থাৎ রুটি পরটার কাই বানানোর মেশিন, অথবা ইটের ভাটার মাটির দলা বানানোর মেশিন।

আদি থেকে অন্ত যেসব মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, মুফতীর উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি তারা সবাই অতি উৎসাহী 'শুয্‌যায'।

সময় একদিন বলে দেবে এ 'গ্রন্থ' এ 'যন্ত্র' ও 'শুয্‌যায' এর বাইরে আর কী কী আছে?

আছে আরেকটি বিষয় যা আজকাল 'ফাকাহাত' ও 'তাফাক্কুহ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করতে খুব বেশি শোনা যায়। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, সে জিনিস যদি দালায়েলে আরবাআ ও নুসূসে আরবাআর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তা হলে তা ধরাছোঁয়ার বাইরে কিছু হওয়ার কথা নয়। তা উসূলে হাদীস, উসূলে তাফসীর ও উসূলে ফিকহ-উসূলে ইস্তিমবাতের আওতাধীন কিছুই হবে। যা উদ্ধৃতিতে আসার মত বিষয়। প্রজন্ম তা বুঝতে পারার মত বিষয়।

সলফের কথা খলফ বুঝতে পারবে না -এ দাবি করার মত কী কী উপাদান প্রস্তুত রয়েছে তাও উপস্থাপন করতে হবে।

আর যদি তা ভেদ-রহস্যের মত বায়বীয় কিছু হয়, তাহলে প্রজন্মের কাছে বায়বীয় পদার্থের যে ভাণ্ডার রয়েছে তারাও সে ভাণ্ডারের মুখ খুলে দেবে। তখন আর এক পক্ষের ভেদ-রহস্য অপর পক্ষ বুঝতেও পারবে না এবং কেউ কারো ভুলও ধরতে পারবে না। প্রত্যেকে নিজের ইলাহ নিজে বানিয়ে নেবে। নিজের পছন্দ মত করে বানিয়ে নেবে।

আর আল্লাহ তাঁর দ্বীন, তাঁর কুরআনের জন্য তাই করবেন যার কথা তিনি আগেই বলে রেখেছন-

﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ (سورة محمد:٣٨)

আল্লাহ আমাদের সবার দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত করুন। সব পক্ষকে সঠিক বুঝ দান করুন। সরল সঠিক পথ দেখিয়ে দিন। সবার ভুল সবার সামনে স্পষ্ট করে দিন। যার ভুল তার সামনেই আগে স্পষ্ট করে দিন। কাউকে তার গোমরাহী ও ভুল শুদ্ধ না করে যেন মৃত্যু না দেন। আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিন।

আসল এতিমরা কোথায়

এতিমের একটি সংজ্ঞা আছে। এতিম লালনের একটি দায়িত্বও আমাদের উপর আছে। এতিম লালনের বিধিবিধানের তাফসীলও কিতাবাদিতে আছে। আমাদের কাছে এতিমের কী অধিকার তাও বলা আছে।

এতিমের শিরোনামে অসহায়ের শিরোনামে আমরা মাদরাসা, জামেয়া, দারুল উলূম করেছি। এর মাধ্যমে আমরা মাদরাসা ও দারুল উলূমের পরিচয়কে বিকৃত করেছি। এ বিকৃতির ফলাফল আমরা দেখেছি, দেখছি এবং আরো দেখব।

অপর দিকে মাদরাসা এতিম অসহায়ের শিরোনাম গ্রহণ করার কারণে এতিম অসহায় লালনের যে দায়িত্ব আমাদের উপর ছিল সে বিষয়ে আমাদের কী কী অবহেলা হয়েছে তাও দেখার মত স্বতন্ত্র একটি বিষয়। এ দিকটির সঠিক ফলাফলের জন্য একটি সহজ পথ হচ্ছে-

আমরা যদি হিসাব নেই, একটি জনপদের কতটি শিশু এতিম ও অসহায়। সে এতিম অসহায়দের মধ্যে কতজন মাদরাসার শিরোনামের এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ে এসেছে। কতজন আপন অবস্থায় রয়ে গেছে? - তা হলে আমরা সহজেই হিসাব পেয়ে যাব যে, এতিম-অসহায় লালনের যে যিম্মাদারী আমাদের মাথায় রয়েছে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তার শতকরা কত ভাগ আমরা পালন করছি এবং কত ভাগ পালন করছি না।

এমনিভাবে আরেকটি হিসাবও করতে হবে, একটি শিশু এতিম-অসহায় হিসাবে আমাদের কাছ থেকে যে যে অধিকার পায় তার কত ভাগ আদায় করছি, আর কত ভাগ আদায় করছি না।

এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে যে এতিমরা আসছে তাদের প্রাপ্য কয়টি হক আমরা আদায় করছি। এমনিভাবে যে কয়েকটি হক আমরা

এতিম অসহায়ের আদায় করছি বলে দাবি করছি, অনুরূপ পরিমাণ অধিকার আমরা এমন ব্যক্তিদেরও দিচ্ছি কি না যারা এতিম অসহায় নয়।

এ ধরনের জবাব দেওয়ার কোন সুযোগ নেই যে, আমরা যতটুকু পারছি ততটুকু করছি। কারণ আমরা যখন মূলনীতিকে লঙ্ঘন করে সব কিছু করে চলেছি তখন সামর্থ্য পরিমাণ দায়িত্ব আদায় হবে না এটাই স্বাভাবিক।

এমন যদি হত

আমরা যদি এতিম অসহায়ের অধিকার এতিম অসহায়ের শিরোনামেই দিতাম তাহলে একই সঙ্গে দু'টি ভাল ফলাফল পেতাম। ইলমে দ্বীন শিক্ষা এতিম অসহায়ের শিক্ষা হিসাবে নিন্দিত ও ধিকৃত হত না, আর এতিম-অসহায় তার সকল অধিকার বুঝে পেত। আমাদেরও এতগুলো অন্যায়ের বোঝা মাথায় নিতে হত না।

কিন্তু আমরা তা করিনি। সব কিছু আমাদের নিজস্ব তৈরি মূলনীতির আলোকেই করার চেষ্টা করেছি। যিকির ও নির্বাচন করে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় করার চেষ্টা করেছি, গরুর রক্ত দিয়ে শহীদ হওয়ার চেষ্টা করেছি, মানুষের দ্বারে দ্বারে চাঁদার থলি নিয়ে ঘুরে ঘুরে দাওয়াতের দায়িত্ব আদায় করার চেষ্টা করেছি।

কারণ, আমাদের কাছেতো দলিলের চাইতে জযবা বেশি শক্তিশালী। আমাদের জযবা যে দিকে ধাক্কা দেবে আমরা মনে করি সেটাই আমাদের করণীয়। কুরআন, হাদীস, ফিকহের স্থূল জ্ঞানতো আমরা পছন্দ করি না। ভেদ রহস্যের যত মূল্য তত মূল্যেতো আমরা শরীয়তকে গ্রহণ করতে আগ্রহী নই।

মনে পড়ে একটি ঘটনা

ঘটনা হয়তো সত্য নয়, উদাহরণ হিসাবে বানানো হয়েছে। তাই বলা যায়। এতিমখানা ও এতিমের বিষয়টি এমন হয়ে গিয়েছে যেমন, আকস্মিক ঝড়-তুফান বা জলোচ্ছ্বাসে এক বাদশাহর বৌ বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছিল। সেই বৌ বাচ্চাকে খুঁজে বের করার জন্য দেশব্যাপী চিরুনী তল্লাশী হল। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হল, হাজার হাজার মানুষ ঘর্মাক্ত হল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সব আনা হল। সপ্তাহ মাসব্যাপী দান-দক্ষিণা বিলানো হল। অন্ন বিলানো হল। বছরের পর বছর পেরিয়ে গেল।

সবশেষে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের পরামর্শে কয়েক টন দুধ চুলায় বসানো হলো। এ দুধ যখন গাঢ় হয়ে সোনা-রুপার ভারি তাবিজও তার মাঝে ডুবে যাবে না তখন তাবিজ কথা বলবে, বাদশাহর বৌ-বাচ্চা কোথায় আছে বলবে।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা গাঢ় দুধের পাতিলের চার দিকে বসা আছে। এক আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল এরপর পাঁচ আঙ্গুলের নৌকা তৈরি করে বার বার মুখে দিয়ে পরীক্ষা চলছে, দুধ যথাযথ গাঢ় হয়েছে কি না? পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছেই। দুধ যথাযথ গাঢ় হয়েছে কি না? কিন্তু কোনভাবে পরীক্ষা আর শেষ হয় না। ইতিমধ্যে তাবিজও দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু পরীক্ষা এখনো চলছে।

একটি অনাথ শিশু আর ক্লিষ্ট চেহারার তার মা ক্ষুধার যন্ত্রণায়, গাঢ় দুধের ঘ্রাণে আরো ক্লান্ত হয়ে এ বাড়িমুখী হয়ে কাছে এসে পৌঁছেছে। বাড়িটি দেখে শিশুটি তার ভিখারিনী মাকে বলে উঠল, মা! এটা না আমাদের বাড়ি? একটু সংশোধন করে বলল, আমাদের বাড়িটা না এরকম ছিল। মা ঝাপসা চোখে একটু তাকিয়ে ছেলেকে বললেন, দূর যা! কত বাড়িই এক রকম হয়।

শিশুর কথা ফেলে দিলেও মার মনে ঠিকই সন্দেহ জেগে উঠেছে, তাইতো! এমনইতো মনে হয়। অনেক কিছু মিলে যায় বলে মনে হয়। কিন্তু এত ছোট্ট কপালে এত বড় প্রাপ্তিকে স্থান দিতে মায়ের হিম্মত হয়নি। এত বছর আগের হারিয়ে যাওয়া সে প্রাসাদ এত সহজে ধরা দেবে -এমন কথা ভাবতে সাহস হয়নি। বাকি আয়োজন যখন চলছে খানার একটা ব্যবস্থাতো হবেই। আর এর ফাঁকে না হয় সুযোগ হলে একটু জিজ্ঞাসা করে নেয়া যাবে, আমাদের সে বাড়ির মত এ বাড়িটি কার?

হাঁটতে হাঁটতে গাঢ় দুধের পাতিলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মা ও শিশু। ব্রাহ্মণ পুরোহিত গাঢ় দুধ মুখে দিয়ে দিয়ে বাদশাহর বৌ বাচ্চার তালাশে এতই বিভোর যে দু'টি অপদার্থ নিচু জাতের প্রাণ কখন এসে দুধের পাতিলের এতো কাছাকাছি এসে গেছে, যে সীমানার মধ্যে এমন মানুষ আসলে তাবিজ আর কথাই বলবে না। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে হাত দিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিতে যাবে অমনি মনে হলে, নিচু জাতের গায়ে হাত লাগলে না জানি আজকের সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়।

প্রহরীকে হাঁক দিল। কোথায় তোমরা! এদেরকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে বের কর। রাজপ্রহরী বলে কথা। শুধু কি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে

দেওয়া?! সে কি গালমন্দ! হতভাগিনী মা আর হতভাগা শিশুর আর খানাও নসীব হল না, কোথায় আর জিজ্ঞেস করতে যাবে, এ বাড়িটি কার।

শিশুর মনে হওয়া তো বলার পরই শেষ। কিন্তু মায়ের সন্দেহ যে আর কাটে না। বুড়ো বকুল গাছটার চেহারাও কেমন পরিচিত পরিচিত মনে হল, শোবার ঘরের বাইরের বারান্দার নকশাটা কেমন পরিচিত মনে হল। দু'একজন পাইক পেয়াদার কণ্ঠও কেমন কেমন মনে হল।

কিন্তু বাদশাহ মহারাজের বৌ-বাচ্চার তালাশে গাঢ় দুধের পাতিলে মত্ত রাজপুরোহিত আর রাজপ্রহরীদের হুংকারের সামনে সেসব মনে হওয়া, পরিচিত লাগা সবই সাঁঝের আঁধারে মিলিয়ে গেছে।

সে ভাগ্যবিড়ম্বিত অভাগিনী মা আর অভাগা ছেলে তাদের পরিচিত সে প্রাসাদ আর খুঁজে পেয়েছিল কি না। পুরোহিতের গাঢ় দুধে ডোবা তাবিজ কথা বলেছিল কি না? সে তাবিজ বাদশাহর বৌ-বাচ্চার নাগাল পেয়েছিল কি না তা আমরা জানতে পারিনি। তা পরবর্তী ইতিহাসবিদরাই ভালো বলতে পারবেন। আমরা এপর্যন্ত অবস্থা জানি।

যাই হোক, এত ছিল একটি ঘটনা যা সত্যও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হল, এক দিকে এতিম-অসহায় তাদের প্রাপ্য অধিকার পায়নি। অপর দিকে দ্বীনের ও ইলমে দ্বীনের একমাত্র এবং একমাত্র সহীহ মানহাজের ধারক-বাহক ওলামায়ে কেরাম, ওলামায়ে দেওবন্দ, ওলামায়ে উম্মতকে জাতির সামনে এতিম-অসহায় ও করুণার পাত্র হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যারা জাতির কর্ণধার তাদেরকে জাতির লেজুড়ে বানানো হয়েছে। যারা পথহারা উম্মতের দিশারী তাদেরকে বানানো হয়েছে পথের ভিখারী। যারা জাতির দাতা ও ত্রাণকর্তা তাদেরকে রূপায়িত করা হয়েছে উচ্ছিষ্টভোগী। এ মানহানীর মামলা আমরা আল্লাহর দরবারে দায়ের করলাম।

এতিম অসহায় না হলে ইলম শেখা ফরয নয়!

ইলমে দ্বীন ও ইলমে ওহির ফরয ইলম শিক্ষার একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদরাসা, জামেয়া ও দারুল উলূমগুলোর সঙ্গে এতিমখানা ও লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামকে এমনভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করার সকল পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং মানেই মাদরাসা। আর মাদরাসা মানেই এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং।

ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে, মুসলমানদের এবং ইলমে ওহি ও ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী শ্রেণির বিশাল একটি অংশও ধোঁকায় পড়ে গেছে। আর যারা ইলমে ওহি ও ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী নয় তারা বিগত প্রায় শত বছরের অনুশীলনে এ ফলাফলে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে যে, এতিম অসহায় হলে তাদের জন্য কুরআন-হাদীসের ইলম শেখা ফরয। যারা এতিম অসহায় নয় তাদের জন্য ইলমে দ্বীন ও ইলমে ওহি শেখা ফরয নয়। কারণ ইলমে দ্বীন ও ইলমে ওহি তথা কুরআন-হাদীস শেখার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডি। এত পেলাম এক ধরনের ফলাফল।

এতিমের প্রতিষ্ঠানে সচ্ছল কেন যাবে?

আরেক রকমের ফলাফল পেলাম, যারা সচ্ছল এবং তাদের সন্তান ও পোষ্য এতিম অসহায় নয় তারা নিজের সন্তানদেরকে এমন প্রতিষ্ঠানে দিতে রাজি নয়, যে প্রতিষ্ঠানে গেলে তাকে এতিম অসহায় হিসাবে পরিচয় দিতে হবে।

একজন ধর্মভীরু ও রুচিশীল বাবা সচ্ছল হয়েও নিজের সন্তানকে এতিম অসহায় বলে পরিচয় দিতে পারে না। আর এটাতো কোন অহংকারের বিষয় নয়।

হাদীসতো বলে, নিজের অসহায়ত্বকে শুধু আল্লাহর সামনে তুলে ধরবে। অসহায় না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অসহায় বলে প্রকাশ করা, বাবা জীবিত থেকেও সন্তানকে এতিমের কাতারে দাঁড় করানো -এটা শরীয়তকর্তৃক অনুমোদিত নয়।

কোন অনুদানদাতা দাতাগোষ্ঠীর সামনে যখন এতিমরা তাদের অসহায়ত্বকে তুলে ধরার জন্য সব ধরনের আয়োজন করবে এবং সব ধরনের কৌশল গ্রহণ করবে তখন একজন ধর্মভীরু রুচিশীল বাবা কীভাবে এ দৃশ্য মেনে নেবে। শরীয়ত ও রুচি দু'টিকেই এক সঙ্গে সে কীভাবে জবাই করে দেবে? এটা হতে পারে না।

ফলে সন্তানকে দ্বীন শেখানোর তাগিদে তাকে খুঁজে বের করতে হয় এমন একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান যা এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ধারন করেনি। খুঁজতে খুঁজতে কখনো পেয়ে যায়, কখনো ক্লান্ত হয়ে ভুল কোন পথ ধরে, আবার কখনো নৈরাশ্যের হাতে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়।

এমন ক'জন অভিভাকই আছেন, যারা শরীয়তকেও জবাই করবেন না, রুচিকেও জবাই করবেন না, আবার নৈরাশ্যকেও স্থান দেবেন না? আমরা যদি এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষগুলোর প্রতি একটু সদয় হতাম তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করতেন।

এ তথ্য আমাদের কাছে আছে

একটি বিশাল শ্রেণি হাকীকত জানে এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এ বিশাল শ্রেণির বাইরে যে শ্রেণিটা রয়েছে তা যে আরো বড় বিশাল তা কি আমরা অনুভব করতে পারি? শতকরা কত ভাগ মানুষ এ হাকীকত জানে?

আমার তো জরিপ হচ্ছে, শতকরা পাঁচ ভাগ মানুষ এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং এর হাকীকত জানে। যার ফলে এসব শিরোনামের কারণে তারা দ্বীনী ইলম শিক্ষা থেকে তাদের সন্তানদের বিরত রাখে না। তা হলে অবশিষ্ট পঁচানব্বই শতাংশের ব্যবস্থা কী?

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বিষয়টিতো শুধু এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডি শিরোনামের হাকীকত জানা নাজানার সঙ্গে জড়িত নয়। এখানে শরীয়তের মাসআলা রয়েছে, রুচির বিষয় রয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন-মানসিকতা নির্মাণের বিষয় রয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কর্মপন্থা নির্ধারণের বিষয় রয়েছে। প্রজন্ম যখন জাতির কর্ণধারের পর্যায়ে উপনীত হবে তখন সে জাতির পরিচালনা পদ্ধতি শেখার বিষয় রয়েছে।

একটি প্রজন্মের নির্মাণ

শুধু তর্ক করার মানসিকতা না থাকলে খুব সহজে বুঝে আসার মত বিষয় হচ্ছে, ইসলাম ধর্মের মত দিগ্বিজয়ী একটি ধর্ম যার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে সারা পৃথিবী এবং যা পরিচালিত হবে কেয়ামত পর্যন্ত সে ধর্মের কর্ণধার, সে ধর্মের শিক্ষার ধারক-বাহক প্রজন্ম যদি লালিত হয় এতিম-অসহায় শিরোনামে, ছিন্নমূল রিফুজি হিসাবে তা হলে সে পরিচালক হবে কাদের।

একজন সচেতন বাবা, সচ্ছল পরিবারের অভিভাবক তাঁর সন্তানকে বানাতে চান চলমান বিশ্বের কর্ণধার, আর তাকে লালন করবেন এতিম-অসহায় এবং সমাজের নষ্ট দুই নম্বর মানুষগুলোর করুণার পাত্র হিসাবে - এটা হতে পারে না? হয়তো তাঁর সামনে কোন স্বপ্ন ও পরিকল্পনা নেই, নয়তো তিনি এ শিরোনামের হাকীকত জানেন না।

এমন কি যদি এতিমও হয়

শুধু সচ্ছল কেন, একজন এতিমের অভিভাবকও যদি তার পোষ্যকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পরিচালক হিসাবে দেখতে চান, পৃথিবীর গোমরাহ মানুষগুলোর পথ প্রদর্শক হিসাবে দেখতে চান তিনিও তাঁর পোষ্যকে এতিম ও অসহায় শিরোনামে লালন করতে রাজি হবেন না। মানুষের দ্বারে দ্বারে করুণার পাত্র হিসাবে ঘোরাবেন না।

এমন সচ্ছল, রুচিশীল ও এতিমের অভিভাবক কখনো চাইবেন না যে তাদের সন্তান বা পোষ্য নিজেকে এতিম, অসহায় মনে করে করে বেড়ে উঠুক। বরং তাঁরা চাইবেন, তাঁদের সন্তান বা পোষ্য যেন কখনো বুঝতেই না পারে যে, সে একজন এতিম বা অসহায়।

কিন্তু আমাদের যে সে স্বপ্নদ্রষ্টাও নেই, আর সে স্বপ্নও নেই। আর এভাবেই আমাদের স্বপ্নগুলো হারিয়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হারিয়ে গেছি।

আমাদের সেই স্বপ্ন

আমাদের সেই স্বপ্নগুলো আজ হারিয়ে গেছে। আমরা আমাদের একটি পবিত্র আত্মার অধিকারী নিষ্পাপ কচি শিশুকে তার পাঁচ/ছয় বছর বয়স থেকে এতিমত্ব ও অসহায়ত্বের অনুশীলন করানো শুরু করেছি। বার/চৌদ্দ বছর যাবত নিরবচ্ছিন্নভাবে সে অনুশীলন করিয়ে চলেছি।

সমাজের সবচাইতে নিম্ন, নিকৃষ্ট ও নিন্দিত একটি শ্রেণি কীভাবে জীবন যাপন করবে, কী তার আচার আচরণ হবে তা আমরা অক্ষরে অক্ষরে তাদেরকে শিখিয়েছি। আর এ সব কিছুর উপর একটি সুন্দর প্রলেপ দিয়েছি। সে প্রলেপের নাম হল 'বিনয়'।

কিন্তু আমরা কখনো বোঝার চেষ্টা করিনি যে, মনিবের সামনে গোলামের বিনয় একটি অর্থহীন বিনয়। শক্তিমানের কাছে দুর্বলের বিনয় কোন গুণ নয়। আমরা আল্লাহর অবাধ্য গোলামদের সামনে নিজেদের কাপুরুষতাকে আল্লাহর সামনে ছোট হওয়ার সঙ্গে তুলনা করার মত ভুল করে বসেছি।

যখন থেকে আমরা আমাদের স্বপ্নগুলোকে হারিয়ে ফেলেছি, তখন থেকে আমরা আমাদের প্রজন্মের গলায় রশি দিয়ে সে রশির মাথা আল্লাহর দুশমনদের হাতে দিয়ে মাথা নিচু করে বিনয়ের সাথে ঘাস খেতে শিখানো

শুরু করেছি। হুংকারের অনুশীলন নিজেরাও করিনি, প্রজন্মকেও করার সুযোগ দেইনি।

যখন থেকে আমরা আমাদের স্বপ্নগুলোকে হারাতে শুরু করেছি তখন থেকে প্রজন্মকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে, দ্বীন ও ইলমে দ্বীন গর্ব করার মত একটি বিষয়। দ্বীন ও ইলমে দ্বীন একটি নেয়ামত। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের চাইতে বড় আর কিছু হতে পারে না।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস

আমাদের সচ্ছল-অসচ্ছল সব রকমের পরিবারের শিশুরা যখন এতিম অসহায়ের পরিচয়ে বড় হয়েছে এবং পৃথিবীর মানুষের করুণার পাত্র হিসাবে চোখ খুলেছে তখন তারা আর বিশ্বাস করতে পারেনি যে, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী তাদের এ পোশাকেরই মানুষ ছিল এবং তাদের এ ইলমেরই ধারক-বাহক ছিল।

তখন তারা বিশ্বাস করতে পারেনি, তাদের এ পোশাকের ধূলোমলিন কিছু মানুষই বিশ্ব পরাশক্তি ইরানের প্রধান সেনাপতিকে মুখের উপর ধমক দিয়ে গিয়েছিল এবং তা বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছিল।

তখন তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে তারা যে ইলম শিখছে সে ইলমের ধারক-বাহকের সেনাপতিত্বেই কাদেসিয়ার যুদ্ধে হাজার বছরের ঐতিহ্য দবদবা পরাভূত হয়েছে এবং চিরদিনের জন্য ধূলায় মিশে গেছে।

তখন তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, সোনালী যুগের সোনার মানুষ বীর পুরুষেরা এ ইলমেরই ধারক-বাহক ছিলেন এবং কুরআন-হাদীসের আঙ্গিনায়ই তাদের লালন পালন হয়েছে।

আমাদের প্রজন্মের বিশ্বাস তৈরি হচ্ছে, খলীফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীনের ইলম ছিল রাজকীয় ইলম, আর আমাদের ইলম হচ্ছে এতিমত্ব ও অসহায়ত্বের ইলম। তারা ছিলেন, পৃথিবীর রাজা, আর আমরা যথাযথ প্রজা হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারছি না।

প্রজন্মের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বপ্নকে মাটিচাপা দেওয়ার এ দায় দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে? কে এ দায়িত্ব নেবে?

﴿ وَما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾

এর ওয়ারিস হওয়ার

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

এর ওয়ারিস হওয়ার এবং সাইয়িদুল মুরসালীনের ওয়ারিস হওয়ার অধিকার কেড়ে নেয়ার দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে।

এ উম্মতের নবীতো এতিম হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অসহায়ত্ব তাঁর জীবনের সঙ্গী ছিল। কিন্তু তিনি কি এ পরিচয়েই বড় হয়েছিলেন? তিনি কার করুণার পাত্র ছিলেন? তিনি কার দ্বারে দ্বারে ফিরেছেন? আমাদের এতিম অসহায়দের আদর্শ কে হবে?

এত দীর্ঘকাল একটি সিংহশাবককে বকরীর সঙ্গে চরিয়ে, প্রায় শতাব্দীকাল একটি বাঘের বাচ্চাকে ঘাস আর ভাতের ফেন খাইয়ে, যুগের পর যুগ তার চেহারা দেখার মত সব ব্যবস্থা সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে যদি তাকে বলা হয় তুমি বাঘের বাচ্চা বা তুমি সিংহের বাচ্চা-

তাহলে সেই সিংহশাবক ও বাঘের বাচ্চা এটাই বুঝে নেবে যে, 'বাঘ' বা 'সিংহ' এগুলো ছাগলেরই প্রতিশব্দ। হয়তো মোচ একটু বেশি আর কম, অথবা নখ একটু ছোট আর বড়। এর বেশি কিছু আর হওয়ার কথা নয়। তাই এর বেশি আশা বুকে বাঁধার কোন যৌক্তিক কারণ নেই।

ফাঁক বের করার চেষ্টা না করলে ভালো হবে কারণ...

তর্কের খাতিরে তর্কপ্রেমিকরা বলতে পারেন, নবীগণের অনুসারীদেরকে কাফেররা সব সময় নিম্ন শ্রেণির মানুষ বলেই গালি দিয়েছে। এতে তাদের কী ক্ষতি হয়েছে? এ গালি বহু পুরাতন। এ ক্ষেত্রে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং নতুন কোন কিছুই সংযোজন করেনি। নূহ আলাইহিস সালামের উম্মত তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছে-

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ.﴾

(هود: ٢٧)

অথচ তারা এতিমখানাও খোলেনি, লিল্লাহবোর্ডিংও বানায়নি।

এই অপচেষ্টাটি করা যাবে না। কারণ-

এক. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অনুসারীদের উপর এটা ছিল শতভাগ অপবাদ। তাঁরা নিজেদের জন্য নিজেরা হীনতার কোন শিরোনাম গ্রহণ করেননি। ধনাঢ্য প্রভাবশালীদের সামনে হীনতা অসহায়ত্ব ও এতিমত্ব প্রকাশ পাওয়ার মত এক বিন্দু শব্দও কখনো ব্যবহৃত হয়নি। বিপরীতটা

প্রকাশ পেয়েছে। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে প্রভাবশালীদেরকে বলে দিয়েছে, তোমরা যদি এ দ্বীন গ্রহণ না কর তাহলে তোমরা মানুষ নয়। প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রেই কাছাকাছি বক্তব্য কুরআনে বিবৃত হয়েছে। এখানে এক দু'টি উদাহরণ দেওয়াই আশা করি যথেষ্ট হবে।

﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ✮ يَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ✮ وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ✮ قَالُوا يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ✮ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ✮ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ✮ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾.

(سورة هود:৫০–৫৭)

এ একই ভাষা ছিল প্রত্যেক নবীর। আহ্বান ছিল সব সময় উপর দিক থেকে। হীনতার দিক থেকে নয়। কাফেররা অপবাদ দিয়েছে, 'হীনরা গ্রহণ করে' বলে। হীনতার শিরোনামে কখনো আহ্বান করা হয়নি।

কাফেরের আচরণ দিয়ে দলিল দিতে হলে এর আগে নবীর ভাষাও উল্লেখ করতে হবে। আমরা যেহেতু নবীর ওয়ারিস তাই আমাদের প্রথম তালাশের বিষয় হবে নবীর ভাষা। আমরা তা করিনি; বরং নবীর ভাষা ভুলে গেছি, ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

আমরা হীনতার শিরোনাম দিয়ে মানুষদেরকে ডেকেছি। এ শিরোনাম বাস্তবভিত্তিক -এ কথা বোঝানোর জন্য সব রকমের কৌশল অবলম্বন করেছি। এরপরও এ অন্যায়ের পক্ষে কুরআনের আয়াত দিয়ে দলিল দেওয়ার দুঃসাহসিকতা দেখানো কিসের আলামত বহন করে।

দুই. প্রত্যেক নবীর যুগে ঈমানের দরজা সর্বস্তরের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং তার স্পষ্ট ঘোষণাও ছিল। সেখানে এমন কোন শিরোনাম ছিল না যে

শিরোনামের কারণে দুনিয়ার বিচারে বড়দের প্রবেশ করতে কোন বাধা ছিল। কুরআনের ভাষা দেখুন-

﴿كَلَّا إِنَّه تَذْكِرَةٌ ✫ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ (سورة المدثر: ٥٤-٥٥)

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ✫ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ✫ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ✫ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ (سورة عبس: ١١-١٤)

হাদীসের ভাষা দেখুন-

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد! فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. (صحيح البخاري،كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده} (صحيح البخاري، رقم الحديث: ٧)

আমরা আমাদের নবীর ভাষাও মনে রাখিনি। মনে রাখার চেষ্টা করিনি। নবীর উপর অবতীর্ণ কুরআনের ভাষা মনে রাখিনি। বিপরীতটা করেছি। নবীর ভাষা ও কুরআনের ভাষা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছি এবং ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

ইলমে দ্বীনের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ার কিছু নমুনা

আবার সেই কারগুজারীর প্রশ্ন। নমুনা উপস্থাপন করার বিষয়ে আমি কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে যাই। উদাহরণ দেব কি দেব না এ বিষয়ে খুব দ্বিধায় পড়ে যাই। আগেও বলেছি সমস্যা দ্বিমুখী। উদাহরণ দিলে পাঠক মন খারাপ করেন। আর না দিলে পাঠক বিশ্বাস করতে চান না। তাই একেবারে না হলেই নয় পরিমাণ উদাহরণ খুব অস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরব। পাঠক বুঝলেও ভালো, না বুঝলে আরো ভালো। এ অংশটি বোঝা এমন কোন জরুরী বিষয় নয়। নমুনা-

ক. আমার এক আত্মীয়। নিজে অনেক বড় আলেম। বিয়ে করেছেন ঐতিহ্যবাহী এক ধর্মভীরু খান্দানে। আলেম তাঁর ইলমের উপর নারায বলে

কখনো বোঝা যায়নি। যেখানে বিয়ে করেছেন সে খান্দান নিয়েও গর্ব করতে দেখা যায়। খান্দানের মেয়েটিও নিজের খান্দান নিয়ে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেছে বলে আমার মনে পড়ে না।

তিন চারটি ছেলের প্রত্যেককেই মাদরাসায় দিয়েছেন। মাদরাসা নামি দামি হওয়া সত্ত্বেও এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের আঁচড় তাতে ছিল। এক, দুই, তিন পর্যন্ত মাদরাসায় দিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন। পড়াতে পারেননি।

কারণ হিসাবে তিনি যা আমাকে বলেছিলেন তার সারমর্ম ছিল, সেখানে এতিমত্বের গন্ধ, অসহায়ত্বের চুলকানী, এতিমদের পরিচালকদের অমানষিকতা ইত্যাদির জ্বালা যন্ত্রণায় একটি ছেলেকেও ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারেননি।

বলাবাহুল্য, গন্ধ আর চুলকানী এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের কোন বৈশিষ্ট্য নয়। দেশের নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পঁচা গন্ধ ও চামড়া ছেঁড়া চুলকানির খবর আমরা দৈনিক পত্রিকাতে পেয়ে থাকি। কিন্তু এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম থাকার কারণেই আমার আত্মীয় ভদ্রলোকের নাকে গন্ধ একটু বেশি লেগেছিল এবং চুলকানীতে হাত একটু বেশি ব্যবহার হয়েছিল।

আর খান্দানী মেয়েটির মুখে আমি হুজুর শব্দের এমন বিকৃত উচ্চারণ শুনেছি যা আমি নামকরা হুজুর বিদ্বেষীদের মুখেও খুব কম শুনেছি। এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের বিকর্ষণ শক্তি তাদেরকে আজীবনের জন্য সুদী কারবারের ধারক-বাহক বানিয়ে ছেড়েছে। আল্লাহ সবাইকে তওবা নসীব করুন।

এর জন্য দায়ী এতিমখানা না কি সে ব্যক্তি -এ নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে। আর তাকদীরের মাসআলায় তো আমাদের কারোই দ্বিমত নেই। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এ মন্তব্য করার মত সাহস ও সুযোগ আমরাই তাকে করে দিয়েছি এবং আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত ও ভুল কর্মপদ্ধতিই এর জন্য দায়ী।

খ. আমার এক বন্ধু। আমার সু ধারণা হিসাবে যারা বন্ধুত্বের বিনিময়ে কোন কিছুই কামনা করে না ইনি তাদের একজন। আর আমার বন্ধু মহলে -যা খুবই ক্ষুদ্র পরিসরের- নির্ভেজাল শুভাকাঙ্ক্ষী দু'চার জনের একজন। তিনি আলহামদু লিল্লাহ হিফয শেষ করেছেন। দু'চার জামাত পর্যন্ত পড়েছেন। একটা সময় পর্যন্ত আমার কাছাকাছিই ছিলেন। জানতাম ভালোই আছেন।

মাঝে দীর্ঘ সময় পার করেছি, আমাদের আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। জীবনের পড়ন্ত বিকেলে যখন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হল তখন আমি তাঁকে সহজেই চিনতে পেরেছি। তিনি আমাকে চিনতে পারেননি। কারণ তিনি দাড়ি মোচ বিহীন সেই বালক রয়ে গেছেন। আর আমি দাড়ি-মোচে জমজমাট একজন হুজুর।

কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ের বিকর্ষণ শক্তি তাঁকে আর বড় হতে দেয়নি। আমি বললাম, এ এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংতো আমিও মাড়িয়ে এসেছি। অতএব যত কারগুজারীই শোনান না কেন দায়ী আপনিই। তিনি বললেন, হ্যাঁ! তা হতে পারে। তবে যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। দায়ী কে সে কথা তালাশ করে আর লাভ কী?

তবে আমি এখনো তাঁকে একজন ভালো মানুষ হিসাবেই জানি। তিনি আসলেই একজন ভালো মানুষ।

আলিয়া মাদরাসা না এতিমখানা মাদরাসা?

গ. একটি পরিস্থিতির মুখোমুখী প্রায় হতেই থাকি। বাসের আসনের পাশের লোকটি, পাশের বাসার প্রতিবেশি, মসজিদের নতুন কোন মুসল্লী, যাত্রীছাউনীতে অপেক্ষমান পাশের লোকটি, টিকিট কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়ানো সামনের বা পেছনের অপরিচিত মানুষটি প্রশ্ন করে বসে,

☞ কি করেন?

মাদরাসায় পড়াই।

☞ এতিমখানা মাদরাসা না কি আলিয়া মাদরাসা?

কওমী মাদরাসা।

☞ সরকারী কোন সহযোগিতা টহযোগিতা?

না। এটা কওমী মাদরাসা।

☞ ও আচ্ছা!

ভাবটা এমন, যেন জীবনে এ জাতীয় কোন মাদরাসার কথা বেচারা এই মাত্র শুনল। কিন্তু বেচারাতো আসলে সে নয়। আসল বেচারাতো আমি হতভাগা।

এ দেশে আলিয়া ও সরকারী মাদরাসা ছাড়াও লক্ষ লক্ষ মাদরাসা যে আছে তা এসব লোকেরা না জানার কোন কারণ নেই। কওমী মাদরাসা সম্পর্কে মানুষ জানবে না তা হতেই পারে না। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যাটা হচ্ছে, যা আমাদের কওমী মাদরসা তা-ই জনগণের কাছে এতিমখানা মাদরাসা।

দুঃখের কথা কাকে বলব

সরকারী মাদরাসাকে মানুষ জানল আলিয়া মাদরাসা শিরোনামে, আর কওমী মাদরাসাকে মানুষ জানল এতিমখানা মাদরাসা শিরোনামে। কেন? এমন কেন হল? যাকে মানুষ আলিয়া মাদরাসা বলে খেতাব করছে সে মাদরাসার হাকীকত কি আমরা জানি না?! সে মাদরাসার হাকীকত কি খোদ সেসব মাদরাসার কর্তৃপক্ষ জানে না। সেসব মাদরাসার হাকীকত কি সাধারণ মানুষের বিশাল একটি অংশ জানে না?

এরপরও আমরা হয়ে গেলাম এতিমখানা মাদরাসার কর্ণধার, আর তারা হয়ে গেল আলিয়া মাদরাসার কর্ণধার। এ জন্য আমরা কাকে দায়ী করলে ভালো হয়?

আলিয়া মাদরাসা নামে খ্যাত মাদরসাগুলোর ছাত্ররাতো এখন মাদরাসার জামাতের নাম বলে এভাবে, আই. এ., বি. এ., মাস্টার্স। এগুলো হচ্ছে মাদরাসার জামাতের নাম। সেসব মাদরাসার ছাত্ররা অমুসলিম শিক্ষকের কাছে ধর্ম গ্রন্থ পড়ে। সহশিক্ষার মহোৎসবে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকে একাকার!

সেসব মাদরাসার একটি পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেরই দৃশ্য সেদিন দেখলাম, একজন নর্তকী প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত করল, এরপর একটি গান গাইল, এরপর মাদরাসা শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আচ্ছা রকমের নসীহত সেবন করাল, এরপর কোথায় যেন তার গানের অনুষ্ঠান আছে সেখানে যেতে হবে বলে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে গেল এবং আরো কিছুক্ষণ থাকতে পারল না বলে সবার কাছে ক্ষমা চাইল।

চেহারা দেখে, পোশাক দেখে, কথা বার্তা শুনে, হাঁটার স্টাইল দেখে, কী পড়েন প্রশ্নের উত্তর শুনেও বোঝার উপায় নেই যে, তিনি মাদরাসায় পড়েন। যতক্ষণ না তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানের নাম বলে শেষে মাদরসা শব্দ উচ্চারণ করবেন।

কী কী কিতাব পড়েন তিনি জানেন না। কী পড়ে কী পরীক্ষা দেন প্রশ্নের উত্তরে যা কিছু বলেন তার কিছু আমরা বুঝি আর কিছু বুঝি না। তাঁদের অনেকে বিভিন্ন দল ও লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, অসাধারণ আরো অনেক কিছু। চেহারা আর পদে এমন বেখাপ্পা মনে হয় না। প্রতিষ্ঠানের নামের শুরুতেও এমন বেখাপ্পা মনে হয় না; কারণ সেখানে

সাধারণত ডিগ্রি বা মাস্টার্স জাতীয় ধরনের কোন শব্দ থাকে। সামান্য সমস্যা হয় প্রতিষ্ঠানের নামের শেষে মাদরাসা শব্দটি দেখলে।

কর্তাপক্ষ-কর্তৃপক্ষ আর কিছু পারেন না পারেন, কিছু দিন পর পর ভাত-কাপড়ের জন্য না খাওয়ার ভান করে মরে যাওয়ার ভান করে প্রধান সড়কের পাশে পড়ে থাকেন। দেশের সেরা চোর বাটপারদের সামনে পোজ দেওয়ার জন্য সব ধরনের অনুশীলন মাসের পর মাস করতে থাকেন।

আর শিক্ষকসংখ্যা ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বাড়িয়ে কাগজ পত্র তৈরি করা, প্রদর্শন করা এবং তার সুবিধা ভোগ করার সকল কৌশল তৈরি করা তো এ অঙ্গনের নিত্য দিনের কাজ।

আর এটা শুধু কর্তৃপক্ষের কাজ নয়; সরকারী নিরীক্ষকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকেও যথেষ্ট পরিমাণ সহযোগিতা পাওয়া যায়। এর জন্য হয়তো কিছু ব্যয় হয়। কিন্তু আমদানী অনেক বেশি। তাছাড়া কিছু বিনিয়োগতো লাগবেই।

কিন্তু এত কিছুর পরও তাদের শিরোনাম আলিয়া মাদরাসা। আর আমাদের হল এতিমখানা মাদরাসা।

এতিমখানার চাইতে আলিয়া ভাল

সরকারী মাদরাসার এতসব সত্য কারগুজারী থাকা সত্ত্বেও, এত সব দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেয়ার পরও একটি অবুঝ শিশু এবং অবুঝ শিশুর নিরক্ষর অভিভাবক যদি মনে করে, যাই হোক তবু এতিমখানার চাইতে আলিয়া ভাল। সে যদি সিদ্ধান্ত নেয়, আলিয়ার সকল সমস্যা থেকে আমি আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব, তবু আমি বেঁচে থাকতে তাকে এতিম হিসাবে পরিচয় দিতে পারব না।

বা শিশু একটু বুঝ হওয়ার পর যদি মনে করে, আমার বাবা বেঁচে থাকতেও আমি এতিম কেন? এতিমখানায় কেন? এবং এত সব ভাবতে ভাবতে এক সময় সে আলিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে -তা হলে বাবার এ সিদ্ধান্তের জন্য এবং শিশুর এ ভাবনার জন্য দোষের অংশ তাদের উপর কতটুকু দেওয়া যাবে? ঈমানী দুর্বলতার অপবাদ তাদের উপর কতটুকু প্রযোজ্য হবে?

বাস্তবে তাই চলছে

যেসব কারণে ইলমে ওহি ও ইলমে দ্বীনের এত স্বচ্ছ সরোবরের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, সে সরোবরে অবগাহনের পরেও এমন একটি প্রতিষ্ঠানের

দিকে ঝুঁকে পড়ছে যার ইলমী পরিয়চয় এখন বিলুপ্ত -সেসব কারণের গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ কি এ শিরোনাম নয়?

আর শুধু শিরোনামই বা বলছি কেন? আমরা তো শুধু শিরোনাম গ্রহণ করিনি। শিরোনামের সর্বোচ্চ ব্যবহারও করেছি। শিরোনামের সর্বোচ্চ প্রচার প্রসার করেছি। শিরোনামের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য সব রকমের অনুশীলন করেছি এবং করে চলেছি।

আমার দেখা, একটি আলিয়ার পাশে একটি কওমী মাদরাসা। তবে কওমী মাদরাসাটির শিরোনামে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং খুব বড় করেই শোভা পাচ্ছে। এলাকার মানুষ তাদের সন্তানকে সহীহ অর্থে হাফেয ও আলেম বানানোর নিয়তে কওমী মাদরাসাটিতে ভর্তি করে দিয়ে যায়।

কওমী মাদরাসা কর্তৃপক্ষ শিশুটিকে কষ্ট করে লালন করে, লালনের সবচাইতে কষ্টকর পর্বটি পার করে যখন তাকে কিতাব বিভাগের দুই এক পর্ব পার করানো হয় তখনই সে ছটফট শুরু করে। সে নিজের প্রতিষ্ঠানের শিরোনাম সম্পর্কেও সচেতন হয়ে ওঠে এবং পাশের মাদরাসার শিরোনাম সম্পর্কেও অবগত হতে থাকে। শিশুর ফটফটানিতে বাবা ও অভিভাবকও সচেতন হয়ে ওঠে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়।

বিগত প্রায় দুই যুগের কারগুজারী থেকে দেখা গেছে, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংয়ে লালিত শিশুদের শতকরা নব্বই/পঁচানব্বই জন তাদের শিক্ষার পরবর্তী পর্ব শেষ করেছে সে আলিয়া মাদরাসায়।

এ নব্বই/পঁচানব্বই ভাগই এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের কারণে হয়েছে -এমন দাবি করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বড় একটি হার যে এর সঙ্গে জড়িত, এ শিরোনামের সঙ্গেই জড়িত এ নিয়ে কি আমাদের সন্দেহ করার কোন সুযোগ আছে?

আমাদের স্বপ্নগুলো এভাবেই ছোট থেকে আরো ছোট হয়ে গেছে

আর এভাবেই আমাদের স্বপ্নগুলো ছোট থেকে আরো ছোট, এরপর আরো ছোট হয়ে চলেছে। আমরা ডিমের কুসুমের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ডিমের সাদা পানিতে ঝাঁপ দিয়েছি। আত্মতৃপ্তিতে বুকের পাঁজরের হাড্ডির মধ্যে কলিজা ঠাসাঠাসি অবস্থা। কিন্তু ডিমের খোসা ভাঙ্গার মত সৎ সাহস আজো আমাদের হয়নি।

ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আমাদেরকে শিক্ষিত বলবে, তিনশত বিধানদাতার রব্বে আলা (بلسان فرعون) আমাদের মানুষ বলবে, সকল ধর্মের

সত্যতায় বিশ্বাসী আমাদেরকে ভালো মানুষ বলবে, এতসব সু ও শুভ সংবাদ শুনে যে আমরা আত্মহারা হয়ে এখনো পাগল হয়ে যায়নি, এটাইতো আমাদের বরদবারীর দলিল বহন করে।

সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় প্রেসিডেন্টকে মসজিদ থেকে বের করে দিতে পেরেছি, সে গর্বে জীবনের অর্ধেক কেটে গেছে। আর 'মন্ত্রী আমাকে বলেছেন' বা 'মন্ত্রী আমাকে ফোন করেছেন' -এ ধরনের বাক্যের গর্বে কেটে যাবে জীবনের অবশিষ্ট অংশ। জীবনে আর চাওয়া পাওয়ার কী আছে এ জাতির! যেন ؟أو سماني ربي এর মকাম ছুঁই ছুঁই করছে। والعياذ بالله।

দারুল উলূম দেওবন্দ এখনো এ শিরোনাম গ্রহণ করেনি

আমাদের উদ্ধৃতি, হাওয়ালা ও রেফারেন্সের তালিকায়তো দারুল উলূম দেওবন্দের চাইতে বড় কোন উদ্ধৃতি নেই -এমনটা আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে অপ্রসঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করে থাকি। এ দারুল উলূম দেওবন্দের নামে বহু সত্য মিথ্যা উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা আমাদের বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। দলিল উপেক্ষা করার বাহানা হিসাবে আমরা দারুল উলূম দেওবন্দকে বহু পাত্রে অপাত্রে অনেক ব্যবহার করেছি।

আর যখন মতলব হাসিলে সমস্যা হবে বলে মনে হয়েছে তখন দারুল উলূম দেওবন্দকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে দিয়েছি।

যেসব ক্ষেত্রে আমরা এমনটি করেছি তার একটি হচ্ছে, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের ব্যবহার। দারুল উলূম দেওবন্দ তার পথ চলার দীর্ঘ এ জীবনে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি ব্যবহার করেনি। দারুল উলূম দেওবন্দ এ শিরোনাম ব্যবহার করলেও আমরা দলিলের মানদণ্ডেই তাকে মাপতাম। এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, যে কাফেলাটি নিজের ব্যাপারে দাবি করতে পছন্দ করে যে, দুনিয়া যে দিকেই যাক দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজের বাইরে এক কদমও রাখা যাবে না। সে কাফেলাটি যখন তাদের মাদরাসা, জামেয়া ও দারুল উলূমের উপর বড় অক্ষরে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি সেঁটে দিয়েছেন, তখন তাদের এ কাজটি দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজের কত কদম বাইরে হয়েছে আর কত কদম ভেতরে হয়েছে তা মাপার মত কোন ব্যবস্থা করার সুযোগ পাননি।

শরীয়ত বিরোধী, রুচিবিরোধী, দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের জন্য মানহানীকর একটি শিরোনাম দেওয়ার সময় শরীয়তকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই,

দারুল উলূম দেওবন্দের অনুসরণে মাদরাসা দিয়ে তার শিরোনামে এতিমখান-লিল্লাহবোর্ডিং লাগানোর সময় দারুল উলূম দেওবন্দকেও জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই। আবার প্রকৃত অনুসারী হওয়ার দাবি করতেও কোন কার্পণ্য নেই!

এটা কি মগের মুল্লুক?!

এখন আর আমাদের দলিলেরও প্রয়োজন নেই, আকাবিরেরও প্রয়োজন নেই, আর দারুল উলূম দেওবন্দেরও প্রয়োজন নেই। এখন এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং এর জন্য তারাই আকাবির যারা সর্বপ্রথম এ এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম চালু করেছেন। খুব সহজ পদ্ধতিতে। আকাবির নির্বাচনের জন্য এর চাইতে সুন্দর পদ্ধতি আর হয় না।

আমরা যে যখন যে অন্যায় করব, যে অপরাধ করব সে অন্যায় ও সে অপরাধের যে প্রথম আসামী সে আমাদের আকাবির। তার সঙ্গে কোনভাবেই বেয়াদবি করা যাবে না। এটাই মূলনীতি (?)।

দায়-দায়িত্ব দারুল উলূম দেওবন্দ কেন নেবে?

কিন্তু এ শিরোনামের পূর্ণ দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দের উপর। এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে যত অন্যায় অপরাধ চলছে এবং এ নামের কারণে শরীয়তের উসূলগুলোকে যে জবাই করা হচ্ছে, এমনিভাবে দ্বীন, ইলমে দ্বীন, হামেলে দ্বীন ও হামেলে ইলমে দ্বীন যে সাধারণ মানুষের সামনে হেনস্তার শিকার হচ্ছে -এ সব দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দের উপর।

শত্রু বাধাহীনভাবে তা করে চলেছে এবং করে যেতে পারছে। এক বুলেটে দ্বীন, ইলমে দ্বীন, হামেলে দ্বীন, হামেলে ইলমে দ্বীন, দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল উলূম দেওবন্দের সকল আকাবির, দারুল উলূম দেওবন্দের অনুসারী ওলামায়ে কেরামের বিশাল কাফেলা, সর্বোপরি অত্র অঞ্চলে ভারত উপমহাদেশে দেড় শতাব্দীকালের বেশি সময় ধরে সিরাতে মুস্তাকীমের-সরল সঠিক পথের, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটি সফল কাফেলাকে আঘাত করে ধরাশায়ী করে চলেছে এবং করে যেতে পারছে?

কিন্তু কেন পারছে?

তাদের এ পারাটা কি কেবলই তাদের শত্রুতার যোগ্যতা? না কি মিত্রের পক্ষ থেকেও এখানে খাল কেটে এমন প্রবাহ তৈরি করা হয়েছে যেখানে শত্রুকুমিরগুলো খুব অনায়াশে তার থাবা বসাতে পারে? বিষাক্ত সাপ তার ছোবল বসানোর মত ব্যবস্থা কি মিত্র পক্ষই করে দেয়নি?

আমি বলব, আমাদের কৃত অন্যায়ের দায়-দায়িত্ব দারুল উলূম দেওবন্দের উপর চাপানোর সব আয়োজন আমরাই করেছি। কারণ, আমরা আমাদের বক্তব্যে, প্রচারপত্রে, শিরোনামে দারুল উলূমকে বার বার টেনে এনেছি। এবং আমরাই এ এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটিকেও দারুল উলূম দেওবন্দের কাঁধেই চাপানোর চেষ্টা করেছি।

পারলে দু'এককদম সামনে বেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, আমরা যারা এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ব্যবহার করি সে আমরাই দারুল উলূম দেওবন্দের আদি ও আসল খাঁটি মুখপাত্র, সঠিক উত্তরসূরি।

এমতাবস্থায়, শত্রুর একটি দোষতো হল সে শত্রু। তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শত্রুতা। কিন্তু এছাড়া আর কোন দোষ আমরা তার উপর চাপিয়ে দিতে পারব? আমাদের অন্যায়ের জবাবও আমরা শত্রুর কাছে চাইব কেন?

এভাবে আমরা দারুল উলূম দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দকে আরেকবার বিকৃতভাবে উপস্থাপন করলাম। এটা আমরা ঠিক করিনি।

এ শিরোনাম না হওয়াতে কী ক্ষতি হয়েছে?

দারুল উলূম দেওবন্দ যে তার স্বাভাবিক নামের পাশে বড় করে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি জুড়ে দেয়নি এর দ্বারা কী কী ক্ষতি হয়েছে? একটি সহজ উত্তর আসতে পারে, দারুল উলূম দেওবন্দের তা প্রয়োজন হয়নি তাই দেয়নি, আমাদের প্রয়োজন হয়েছে তাই দিয়েছি।

এ ধরনের উত্তর থেকেই হাকীকত বের হয়ে আসে যা সাধারণ আবস্থায় আমরা স্বীকার করতে চাই না। হাকীকত হচ্ছে, আমরা এসব শিরোনামের প্রেমে পড়েছি প্রয়োজনের কারণে, বাস্তবতার ভিত্তিতে নয়।

প্রয়োজনটা কার? দ্বীনের না ব্যক্তির? এ প্রশ্নের উত্তরে হয়ত আমরা আবার নীরব হয়ে যাব। কারণ দ্বীনের কোন অন্তসারশূন্য শিরোনামের প্রয়োজন নেই এবং এমন দ্বীন কখনো এমন প্রয়োজনের মুখে পড়ার কথা নয়।

দ্বিতীয় আরেকটি জবাব আসতে পারে, দারুল উলূম দেওবন্দ হচ্ছে মাদারে ইলমী। সেখানে এ শিরোনাম আসবে কেন?

এ উত্তরটি আসলে কোন উত্তরই নয়। কারণ, দারুল উলূম দেওবন্দ তার জন্মলগ্নেই মাদারে ইলমী হয়নি। যেসব মাদরাসা ও জামেয়া বর্তমানে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে চলছে সেসবের চাইতে অনেক ক্ষুদ্র ও সীমিত পরিসরে দারুল উলূম দেওবন্দ তার যাত্রা শুরু করেছে। তখনও দারুল উলূম দেওবন্দের এ শিরোনাম প্রয়োজন হয়নি। আজো আলহামদু লিল্লাহ প্রয়োজন হচ্ছে না।

আর যদি কেউ বেনামাযীর মত বাহাত্তর ওজর খুঁজতেই থাকে তাহলে তার সঙ্গে আমরা কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমরাতো বাস্তবভিত্তিক কিছু কথা আলোচনা করে নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে চাই। নিজেদের সংশোধন করতে চাই।

এ শিরোনাম বড় করে আমরা কী করতে চাই?

এর শিরোনাম ব্যবহার করে এবং প্রতিষ্ঠানের মূল শিরোনামের চাইতে এ শিরোনামকে বড় করে ফুটিয়ে তুলে আমরা কী কী লাভ করেছি এবং ভবিষ্যতে আর কী কী লাভ করতে চাই?

একটি দলতো হচ্ছে চোর-ডাকাতের দল এবং মুলহিদ ও যিন্দীকের দল, যারা তাদের যেকোন কর্মকাণ্ডে দ্বীনের ও ইলমে দ্বীনের কী ক্ষতি হল তা দেখার কোন প্রয়োজনবোধ করে না। তারা দ্বীনকে বিক্রয় করে, ইলমে দ্বীনের শিরোনামকে বিক্রয় করে, শরীয়তকে বিকৃত করে পকেট ভারি করতে চায়। তারাতো-

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (البقرة: ٧٩)

-এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের উদ্দেশ্য আমাদের সামনে এবং সবার সামনে স্পষ্ট।

কিন্তু এসব শিরোনামে যারা কাজ করছেন তাদের অতি ছোট্ট ও ক্ষুদ্র দল হচ্ছে চোর-ডাকাত ও মুলহিদ-যিন্দীক। এ ছোট্ট দলটি ছাড়া এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ধারণকারীদের বিশাল একটি কাফেলা রয়েছে যাঁরা এ ধরনের ভ্রষ্ট চিন্তা লালন করেন না। তাঁদের প্রতিই আমাদের প্রশ্ন, আমরা এ শিরোনাম গ্রহন করে দ্বীনের ও ইলমে দ্বীনের এমন কোন ফরয দায়িত্ব আদায় করতে চাই যা এ শিরোনাম ছাড়া সম্ভব নয়।

এমনিভাবে তাঁদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, এমন কী কী শরয়ী দায়িত্ব রয়েছে যা দারুল উলূম দেওবন্দ এবং দারুল উলূম দেওবন্দের মত দেশ বিদেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাদরাসা করতে পারেনি, আর আপনারা এ শিরোনামে তা করতে পেরেছেন, পারছেন এবং পারতে থাকবেন?

তাঁদের কাছে আমাদের শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামটি ব্যবহার করতে গিয়ে শরীয়তের যে পরিমাণ অঙ্গ কেটে ও ছেটে ফেলতে হয়েছে, তার কতভাগ এ শিরোনাম ব্যবহার করে পুনরুদ্ধার করা যাবে? এ কাটছাটের শরয়ী বিধান কী? এবং হারিয়ে যাওয়া সম্পদ আবার ফিরে পাওয়ার পথ কী?

বাস্তবতা কী বলে?

প্রায় শতাব্দীকাল পার হওয়ার পরও কি আমরা হিসাব মিলাব না? শরীয়তের মূলনীতির খেলাফ, অনুসৃত মানহাজের খেলাফ একটি কাজ করে চলেছি। এখনো আমরা বাস্তবতার বিচার ও মানদণ্ডকে সামনে আনতে রাজি নই। আমরা একটি ভিত্তিহীন ধারণা এবং একটি দিবাস্বপ্নকে পুঁজি করে বাস্তবতার বিরুদ্ধে গায়ের জোরে ঠেলা দিয়ে সামনে যেতে চাই।

যে কোন পরিস্থিতির জবাবে একটি আশঙ্কাকে সামনে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করি। সে আশঙ্কা হচ্ছে, 'যদি এভাবে না করা হত তা হলে দ্বীন ও ইলমের এখন যতটুকু আছে তাও থাকতো না'। এই একটি আশঙ্কার ঢাল ব্যবহার করে দ্বীনের বহু অবৈধ কাজকে আমরা বৈধতা দিয়ে চলেছি।

এ প্রসঙ্গ এলে লেখা অন্য দিকে চলে যাবে। কারণ, এ অজুহাতে আমরা কত হাজার হাজার অবৈধকে বৈধ বলে বুকে জড়িয়ে নিয়েছি তার তালিকার কোন অন্ত নেই। এর তালিকার জন্যই চাই একটি স্বতন্ত্র রচনা। আমরা এখন সে দিকে যেতে চাই না।

পৃথিবীতে যত ধরনের বিদআত এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে সেসব বিদআতের অনুসারীদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে মনে করা হয় তারা মুতা'দিল, তাদের সেসব বিদআতের পক্ষে শেষ দলিল হিসাবে এ ঢালটি খুব ব্যবহার হয়েছে।

যারা সারা জীবন মিথ্যুকদের বানানো জাল হাদীস ব্যবহার করেছে তাদের পক্ষে সর্বশেষ দলিল হিসাবে এ ঢাল ব্যবহার হয়েছে। যারা একটি কাজ করে সকল ফরয দায়িত্ব আদায় করার চেষ্টা করেছে তাদের পক্ষেও

সর্বশেষ দলিল হিসাবে এ ঢালটি ব্যবহার হয়েছে যে, 'যদি এভাবে না করা হত তাহলে দ্বীন ও ইলমের এখন যতটুকু আছে তাও থাকতো না' অথবা 'আমরাতো তাও এতটুকু করলাম। আপনি বা অপনারা কী করেছেন?'

কিন্তু এ উক্তিগুলো ও এ কর্মপন্থাগুলোর বিষয়ে শরীয়ত কী বলে?

শরীয়ত কী বলে?

'নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো' -এটাতো আমাদের প্রবাদ প্রবচন। এটাকে যদি আরবীতেও বলা হয় ما لا يدرك كله لا يترك كله তবুও তা একটি প্রবাদই। আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য শরীয়তের ফায়সালা লাগবে। এ প্রসঙ্গে দু'টি বিন্দুতে কথা বলা যায়। **এক.** আসলেই নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো কি না? **দুই.** আমরা যাকে কানা মামা বলছি সে আসলে কানা মামা না কি নাই মামা?

কানা মামা

এক. প্রথম বিষয় হচ্ছে, আসলেই নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো কি না? আসলেই কি সবাই এ বিষয়ে একমত যে, নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো? শরীয়তের মানদণ্ডে মাপতে গেলে এই প্রবাদের পক্ষে দলিল পাওয়া যাবে না কি বিপক্ষে দলিল পাওয়া যাবে, না কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ প্রবাদটি প্রয়োগ করা যাবে, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ প্রবাদটি প্রয়োগ করা যাবে না?

এ বিষয়ে একটি উদাহরণ সামনে আনা যেতে পারে। তাহলে বিষয়টি সুরাহা করতে আশা করি সহজ হবে। যেমন আহত মাযুর ব্যক্তির নামাযই ধরুন। সে চার রাকাত নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায়। সে কারণে সে যোহর, আসর ও এশা -এ ফরয নামাযগুলো এক রাকাত বা দুই রাকাত করে পড়ে।

একজন শুনে বললেন একদম না পড়ার চাইতে এক দুই রাকাত করে পড়াই ভালো। ফাতওয়া দিতে গেলে এটাও পড়বে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদ ঠুকে দিলেন 'নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো'।

আরেক আহত মাযুর একই ওযরের কারণে চার রাকাত নামাযের সব রাকাত দাঁড়িয়ে না পড়ে বসে বসে পড়ে, বা শুয়ে শুয়ে ইশারা করে পড়ে।

একজন শুনে বলল, তাও ভালো। একদম না পড়ার চাইতে এভাবে পড়াই ভালো। প্রবাদ ঠুকে দিলেন 'নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো'।

শুনতেতো দু'টি ক্ষেত্রেই প্রবাদ যুতসই ঠোকা হয়েছে। প্রবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলেতো দু'টিই সঠিক। দু'টি পদ্ধতির ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত হবে। দুই পদ্ধতির সিদ্ধান্ত দুই রকম হবে না। উভয় পদ্ধতিতে ফাতওয়া দেওয়া হবে, ঠিক আছে।

কিন্তু ফাতওয়াদাতা যদি প্রবাদের পেছনে না পড়ে কিতাবের পাতা খুলে দেখেন তাহলে উভয় ক্ষেত্রে কি একই সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব? উভয়টির ক্ষেত্রে কি বলা সম্ভব যে, উভয় পদ্ধতি সঠিক? বা উভয় পদ্ধতির ব্যাপারে মুফতীর জন্য কি এ কথা বলা সম্ভব হবে যে, নাই মামার চাইতে কানা মামাই ভালো?

যারা বলবে, উভয় ক্ষেত্রে এ প্রবাদ ব্যবহার করা সম্ভব তাদের সঙ্গে আমরা তর্কে জড়াবো না। কারণ তারা শয়তান। আর যারা বলবেন, না উভয় ক্ষেত্রে একই ফাতওয়া সম্ভব নয় এবং এ প্রবাদ প্রয়োগ করা যাবে না তাদের কাছে আমি সবিনয় নিবেদন করতে চাই-

আল্লাহর ওয়াস্তে শরীয়তের এত জটিল জটিল মাসআলাগুলোকে প্রবাদ-প্রবচন দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। যদি যোগ্যতা না থাকে বা সময় না থাকে তাহলে আমানতদার আহলে ইলমদের মধ্য থেকে যাদের উপর আপনাদের আস্থা হয়, তাদের সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাঁদেরকে এ জটিল মাসআলাগুলো সমাধান করার জন্য অনুরোধ করুন।

যারা উম্মতের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন বা উম্মত মনে করছে আপনাদের কাঁধেই এসব কিছুর দায়িত্ব, সেসব দায়িত্বের জবাবদিহির কথা একটু স্মরণ করুন। কিতাবকে ঘৃণা করা ত্যাগ করুন। দলিলকে উপেক্ষা করা ত্যাগ করুন।

নাই মামা

দুই. দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আসলেই আমরা যাকে কানা মামা বলছি সে আসলে কানা মামা না কি নাই মামা? একটি ফরয দায়িত্বের পরিবর্তে আরেকটি কাজ করে আমরা যখন দাবি করি, একদম কিছু না করার চাইতে কিছু একটা করা ভালো। কারণ, নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো। -এ

দাবিটা তখনই সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যখন আপনার উদ্ভাবিত পদ্ধতিটিকে শরীয়ত 'কানা মামা' বলে স্বীকার করবে।

একটি উদাহরণ দিয়েই তা বোঝার চেষ্টা করি। এক ব্যক্তির উপর রোযা রাখা ফরয। কিন্তু ক্ষুধা-পিপাসা সে সহ্য করতে পারে না। এ জন্য সে ফরয রোযার পরিবর্তে নফল নামায বাড়িয়ে দিল। নফল নামায এত পরিমাণে বাড়িয়ে দিল যে, এ বিষয়ে সে মানুষের সামনে প্রকাশ করতেও কোন প্রকার লজ্জাবোধ করল না। পারলে আরো দু'চার জনকে তার পথে আহ্বানও করল। দল ধীরে ধীরে ভারিও হয়ে উঠল। যাদেরই না খেলে খিদে লাগে, পানি পান না করলে পিপাসা লাগে তারা এ দলে ভিড়তে লাগল।

একজন শুনে বলল, তবু নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো। কত মানুষতো নামাযও পড়ে না রোযাও রাখে না।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যক্তি যে ফরয রোযা ছেড়ে নফল নামায বাড়িয়ে দিল এটা কি 'কানা মামা' না কি 'নাই মামা'? এখানে এসে মনে হয় আমাদের অংকে বড় রকমের একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। ভুলটা ধরতে গিয়েও আমরা ধরতে পারছি না বা ধরছি না। এখানে হাত দিলেই যেন হিসাব নিকাশ একটু বেশি রকমের ওলট-পালট হয়ে যাবে।

আগের উদাহরণে যে বলা হয়েছে, লোকটি ওযর বশত চার রাকাত নামাযকে এক দুই রাকাতে সেরে ফেলছে -তার এ এক দুই রাকাতও মূলত 'কানা মামা' নয়, সেটা আসলে 'নাই মামা'। শরীয়ত যে হুকুম দেয়নি, যেভাবে হুকুম দেয়নি, যাকে হুকুম দেয়নি সেসবগুলোর হাকীকত হচ্ছে 'নাই মামা', সেগুলোর কোনটিই 'কানা মামা' নয়।

শরীয়তে কোন কানা মামা নেই

দীর্ঘকাল ব্যাপী এবং অনেক দীর্ঘকাল ব্যাপী আমরা বহু 'নাই মামা'কে 'কানা মামা' ভেবে ধোঁকা খেয়ে চলেছি। আমাদের সে ধোঁকা খাওয়ার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন ওযরও নেই।

আসলে শরীয়তে 'কানা মামা'র কোন অস্তিত্ব নেই। শরীয়ত কোন কানা মামাকে স্বীকার করে না। কারণ-

মাযুর ব্যক্তি যখন শরয়ী ওযরের কারণে নামায দাঁড়িয়ে না পড়ে বসে বা শুয়ে নামায আদায় করে তখন তার এই নামায একটি পূর্ণাঙ্গ নামায।

এতে না ফরয আদায়ের মধ্যে কোন ক্রুটি আছে আর না সাওয়াবের মধ্যে কোন প্রকার কমতি আছে।

একটি ফরয ইবাদত ও আমলের বিকল্প যখন শরীয়ত থেকে নেয়া হবে, দলিলের আলোকে নেয়া হবে তখন বিকল্প পদ্ধতিটিই ফরয দায়িত্ব, সেটিই আমল, সেটিই কাজ। তাকে কানা মামার সঙ্গে মিলানোর কোন বৈধতা নেই। শুধু শর্ত হলো, বিকল্পটা শরীয়ত থেকে নিতে হবে। নিজের আবেগ থেকে নেয়া যাবে না। আবেগ থেকে নিলে তা দ্বারা দায়িত্ব আদায়েরতো প্রশ্নই আসে না; বরং তা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামে যতটুকু কাজ চলছে তা না চললে ইলমের যতটুকু গন্ধ এখনো পাওয়া যাচ্ছে তাও থাকতো না - এমন আবেগের কথা দিয়ে এত বড় একটি বিষয়ের বৈধতা দেওয়া যায় না। এর জন্য শরীয়তের সুস্পষ্ট দলিল লাগবে।

এতগুলো অবৈধতাকে দলিল ছাড়া মাড়িয়ে যেতে হলে এর চাইতে শক্ত দলিল লাগবে, নয়তো স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে ঈমানকে বিক্রয় করে দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আমীন।

'কওমী মাদরাসা' শিরোনাম হল না কেন?

আমরা জানি আমাদের এ মাদরাসাগুলো কওমী মাদরাসা। আমরা বলি কওমী মাদরাসা। এ মাদরাসার হাকীকত হল কওমী মাদরাসা। অর্থাৎ, সরকারী মাদরাসার বিপরীত শব্দ হিসাবে 'বেসরকারী' একটি নেতিবাচক শব্দের তুলনায় আমরা 'কওমী' শব্দটি পছন্দ করেছি। এ শব্দটিতো খারাপ ছিল না।

কিন্তু এ নামে আমরা আমাদেরকে পরিচিত করাতে পারিনি এবং সে জন্য চেষ্টাও করিনি। চেষ্টা করিনি বলছি এ কারণে যে, আমরা আমাদের দারুল উলূম, জামেয়া ও মাদরাসার নামের আগে পরে এতিমখানা লিল্লাহবোর্ডিং পরিভাষাদু'টি ফুটিয়ে তোলার জন্য যে কালি ব্যয় করেছি তার কত ভাগ কালি কওমী মাদরাসা পরিভাষাটি ব্যবহার করার পেছনে ব্যয় করেছি?

আমরা তো আমাদের মাদরাসার নামের উপরে বা নিচে বড় করে কওমী মাদরাসা লিখে দিতে পারতাম। এ পরিভাষায় যদি আমাদের পরিচয় হত এবং এ পরিভাষাই যদি সবার মুখে থাকতো তাহলে বড় কোন সমস্যা

ছিল কি না আমার জানা নেই। কিন্তু এতটুকুতো নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনাম ব্যবহার করে শরয়ীভাবে ও সামাজিকভাবে যে বিপাকে পড়েছি তা কখনো হত না।

আমার তো এ বিষয়ে সন্দেহ হয় না। কারো এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলে তা তিনি বলতে পারবেন।

আমরা কেউ কেউ লিখেছি। যারা লিখেছি তারা তিন প্রকার।

এক. যারা কওমী মাদরাসা লিখে আবার এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিংও লিখে দিয়েছেন। আর মৌখিক পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে, কাগজে পত্রে ম্যাকাপ ও গেটাপে তাকে এতিমখানা লিল্লাহবোর্ডিং হিসাবেই উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

দুই. যারা কওমী মাদরাসা লিখেছেন তবে তা লিখেছেন আরবীতে। 'আলমাদরাসাতুল আহলিয়্যাহ' এভাবে। যা শুধু তারাই বুঝেছে যারা কোন কিছু না লিখলেও বুঝতে পারত।

তিন. যারা শুধু কওমী মাদরাসা শিরোনামই দিয়েছেন। নামের মধ্যে আর কিছু ব্যবহার করেননি। বাকি হালাত আল্লাহ ভালো জানেন।

যাই হোক বলা যায়, কোন কারণ ছাড়াই আমরা আমাদের মোটামুটি সমস্যামুক্ত ও বাস্তবতার কাছাকাছি শিরোনামটি পরিহার করেছি। অথচ সেটাই ছিল আমাদের শিরোনাম। এর রহস্যও অস্পষ্ট রয়ে গেল।

মানুষ কেন কওমী মাদরাসা বলে না?

আমরা কেন মানুষের মুখে কওমী মাদরাসা পরিভাষাটি তুলে দিতে পারলাম না? এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং শিরোনামের যে পাহাড়সম সমস্যা রয়েছে তার কোনটিইতো কওমী মাদরাসা শিরোনামে নেই। শরয়ী সমস্যাও নেই, সামাজিক সমস্যাও নেই এবং অবাস্তবতার সমস্যাও নেই। ভিন্ন কোন সমস্যা থাকলে থাকতে পারে। কিন্তু এ সমস্যাগুলোতো হতো না।

এর কি কোন গোপন রহস্য রয়েছে যা আমরা বুঝতে পারব না। না কি কাকতালীয়ভাবে তা হয়ে গেছে। যদি কাকতালীয়ভাবে হয়ে থাকে তাহলে এর কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে আমরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই কেন? ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া একটি ভুলতো স্থায়িত্ব পেতে পারে না। বিশেষত যখন তাতে শরয়ী সমস্যা দেখা দেয়।

এছাড়া সমস্যাগুলো আলোচিত, সমালোচিত। সমস্যাগুলোর মুখোমুখী আমরা প্রতিদিন। এ বিষয়ক প্রশ্ন আমাদের সামনে প্রতিদিন। এত কিছুর

পরও 'কওমী মাদরাসা' ও 'এতিমখানা মাদরাসা' এ দু'টি শিরোনামের এতো বিশাল ব্যবধানকে আমরা কোন প্রকার তোয়াক্কাই করিনি। কোনভাবেই আমাদের সমস্যার তালিকার মধ্যে আনিনি। এটা আসলে আমরা ঠিক করিনি। এর দায় দায়িত্ব আমাদের সর্বস্তরের উপর কিছু না কিছু হলেও আসবে। আমরা এ দায় এড়াতে পারব না।

আমরা চেষ্টা করলে মানুষের মুখে 'কওমী মাদরাসা' শিরোনামটি তুলে দিতে পারতাম। আমাদের সদিচ্ছার অভাবে, অথবা সচেতনতার অভাবে, অথবা জ্ঞানের অভাবে কাজটি করিনি।

একটি সাময়িক ব্যবস্থাকে এতো দীর্ঘায়িত করা যায় না

যদি কেউ বলতে চান বা বলেছেনও যে, সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ ধরনের বা এর চাইতেও কঠিন ও নাজুক সিদ্ধান্তও নিতে হয়। ইসলামী খেলাফত সমূলে উৎপাটনের পর সময়ের দাবি অনুযায়ী এটি একটি কৌশল ছিল। এর সমালোচনা করতে হলে এর প্রেক্ষাপট সামনে থাকতে হবে তাহলেই এর সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ হবে।

এটি একটি যৌক্তিক দাবি। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কয়েকটি নিবেদন রয়েছে। নিবেদনগুলো হচ্ছে-

এক. মুসলমানদের কেন্দ্রীয় খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর সারা মুসলিম বিশ্ব একই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। কিন্তু আমাদের ভূখণ্ডটি এর সমাধানের জন্য এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং এর যে শিরোনাম গ্রহণ করেছে এ শিরানাম অন্য কোন ভূখণ্ডে প্রয়োজন হয়নি কেন?

দুই. ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর এর বিকল্প হিসাবে শরীয়তের পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ না করে, সে পথে না গিয়ে আমরা এ শিরোনাম গ্রহণ করলাম কেন?

তিন. যা করা হয়েছে তা শরীয়তের মাসআলা না দেখে করলাম কেন? আমাদের সামনে যে পরিস্থিতিই আসবে সে পরিস্থিতির জন্যই শরীয়তের পক্ষ থেকে আলাদা করে বিধান দেওয়া আছে। আমরা সে মুখী হলাম না কেন?

চার. সর্বশেষ নিবেদন, যদি এটি একটি সাময়িক সমাধান হয়ে থাকে এবং পরিস্থিতি প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে তাহলে এর মেয়াদ এত দীর্ঘায়িত হল কেন? এর কোন অন্ত নেই কেন?

যদি বলা হয়, পরিস্থিতি শেষ হয়নি তাই এর মেয়াদও শেষ হয়নি। তাহলে আমাদের প্রশ্ন-

ফ্রিজে পানিকে বরফ বানিয়ে রেখে রেখে আর কতকাল আমরা ঠাণ্ডার ওযরে তায়াম্মুম করতে থাকব? শরীয়ত আমাদেরকে কতকাল এর অনুমতি দেবে?

এখন প্রজন্ম কী করবে?

এত সব যা শুনানো হল তার কিছু অতিত, আর কিছু বর্তমান। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী করবে? আমরা তাদেরকে কী পরামর্শ দেব? বড়রা তাদেরকে কোন পথে চলতে বলবেন?

যেসব কারগুজারী তুলে ধরা হয়েছে তাতে প্রথম যে ব্যাপারটি ঘটবে তা হচ্ছে, প্রজন্মের তরুণরা পেরেশান হবে।

একটি অংশতো আছে এমন যারা হয়তো এসব কথায় কানই দেবে না। তাছাড়া বড়দের পক্ষ থেকে এসব কারগুজারী শোনার নিষিদ্ধ বিধানতো আগে থেকে আছেই। পুরাতন জিনিস নিয়ে নতুন করে পেরেশান হওয়ার ঝামেলায় তারা জড়াতে চাইবে না।

একটি কাফেলা এবং বলা যায় একটি বড় কাফেলাই ইতিমধ্যে এসব কর্মপন্থার মাঝে পরিবর্তনের ফিক্র শুরু করেছে এবং আলহামদু লিল্লাহ অনেক দূর অগ্রসরও হয়েছে বলা যায়। কাঁচা হাতে হওয়ার কারণে সেগুলোতে কিছু কিছু দুর্বলতা আছে সে কথা স্বীকার করে নিলেও বলা যায়, তারা যতটুকু হিম্মত করেছে দায়িত্বশীল কাফেলা যদি তাদেরকে আরেকটু হিম্মত দেন এবং বিরূপ মন্তব্য করে তাদেরকে হীনমন্যতায় ফেলে না দিয়ে তাদেরকে হিম্মতের যোগান দেন, তাহলে আশা করা যায় উম্মত এর একটা ভালো ফলাফল ভোগ করতে পারবে। একটা নতুন প্রবাহ শুরু হবে বলে আমরা আশা রাখতে পারি। এ কাফেলাটিরও নতুন করে পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই।

কিন্তু প্রজন্মের যে কাফেলাটি বিষয়গুলো নিয়ে এখনো ভাবেনি, বা বিষয়গুলোকে এভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। কারগুজারীগুলো তার জন্য একেবারে নতুন বা প্রায় নতুন বা এর এত ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। আবার স্বভাবগতভাবে ভাবার মত মানসিকতা আছে -তারা অবশ্যই পেরেশান হয়ে যাবে। এ পেরেশনীর জন্য তারা এ লেখককেও বকাঝকা

করতে পারে, আবার বিপরীত কিছুও হতে পারে। কোন সম্ভাবনাকেই নাকচ করে দেওয়া যায় না।

যাই হোক, তাদেরকে আমরা কী পরামর্শ দেব? আমরাতো আর পেরেশান হয়ে এ কথা বলতে পারব না যে, দারুল উলূমেরও দরকার নেই, এতিমখানারও দরকার নেই। গিয়ে ছাগল চরাও বা ব্যবসা-বানিজ্য কর। বেয়াদবির চাইতে গায়রে হাজিরই ভালো। এ পরামর্শ দেওয়া যাবে না। কারণ, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

বড়রাতো বড়দের মত করে বলবেন। আমি আমার মত করে এ বিষয়ে বলতে পারি-

প্রজন্ম আগে ইলম বিষয়ক তার ফরয দায়িত্ব নির্ধারণ করবে। এর পর সে এ দায়িত্বের গণ্ডি নির্ধারণ করবে। ফরয ইলমের বাস্তবভিত্তিক চাহিদা নির্ধারণ করবে। নিজের সামর্থ্যের পাকাপোক্ত হিসাব নিবে এবং ধারণানির্ভর, সমাজের প্রচলননির্ভর এবং মানুষের মন্তব্যনির্ভর কোন হিসাবের উপর নির্ভর করবে না। এরপর ইলমের ফরযদায়িত্ব পালনে করণীয় নির্ধারণ করবে।

এ কয়েকটি কাজ করার পর কুরআন, হাদীসের সমন্বয়ে ফিকহের সিদ্ধান্ত যথাযথ ব্যক্তি ও স্থান থেকে গ্রহণ করবে। বাস্তবায়নের প্রণালী সলফ থেকে নেবে। সলফের বাস্তবায়ন পদ্ধতির যেই যেই বিন্দুতে গিয়ে হাদীস, কুরআন সমন্বিত ফিকহের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বৈপরীত্য আছে বলে মনে হবে, সে বিন্দুতে তাহকীক করে সঠিক ও স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। সঠিক ও স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগ পর্যন্ত কুরআন, হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্তের উপর চলতে থাকবে।

দলিলের ইত্তেবা ও সলফের ইত্তেবায়ের এ তারতীবের বিষয়ে সলফের কোন দ্বিমত নেই। আর যে বিষয়ে সলফের কোন দ্বিমত নেই সে বিষয়ে সলফের অনুসরণে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।

কচিপাতা শুকনোপাতা

যে পাতাগুলো আর যে ডালগুলো শুকিয়ে গেছে সেগুলোতে আমরা আবার প্রাণের সঞ্চার করব এমন হিম্মত এখন আর নেই। এসব বিষয়ে লেখা শুরু করার আগে হিম্মত যে পরিমাণ সঙ্গ দিয়েছিল, লেখা পাঠকের হাতে পৌঁছার পর নৈরাশ্যজনক প্রতিক্রিয়ার পর সে হিম্মত আর এখন সঙ্গ দিচ্ছে না।

কিছু সমস্যার অনুভূতি আগে থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলাম এবং বলতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু কথা বলার পর যে উপলব্ধি হয়েছে তা আগে হয়নি। সমস্যা যে এত গভীর এত গভীর তা আগে উপলব্ধি করতে পারলে হয়ত হিম্মত হত না।

যাই হোক, সমস্যার গভীরতা আগে বুঝতে না পারা এবং পরে বুঝতে পারার মাঝে কোন মঙ্গল লুকিয়ে থাকতে পারে। দলিল হিসাবে নয়, শুধু বরকতের জন্য হলেও একটি আয়াত এখানে উল্লেখ করতে মন চাচ্ছে। মনে আসল তাই উল্লেখ করছি। জটিল কিছু ভাবার দরকার নেই।

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ **وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا** لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ☆ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا **وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ** وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ☆ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ **(سورة الأنفال: ٤٢-٤٤)**

কমপক্ষে সান্ত্বনা গ্রহণ করতে সমস্যা কী? এখানে তো কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।

যাই হোক বলছিলাম, শুকনো পাতায় প্রাণ ফিরে আসবে সে আশা করার মত হিম্মত আমাদের নেই। বাকি আল্লাহ পাকের কুদরতের কাছেতো কঠিন বলতে কিছু নেই, আর অসম্ভব হওয়ারতো প্রশ্নই আসে না। তাই হিম্মত না হলেও নিরাশ হইনি।

হিম্মত করে যেখানে আশার ফুল ফোটাতে চাই তা হলো কচিপাতাগুলো। কেবলই ভাবতে ভালো লাগে, বুকে আশা বাঁধতে মনে চায় যে, নতুন যে পাতাগুলো গজাবে, প্রচণ্ড শীত ও কুয়াশা ভেদ করে যে মুকুলগুলো সূর্যের আলো দেখবে, ঘন অন্ধকারেও রাত জেগে যে কলিগুলো ভোরের আলোতে হেসে উঠবে, তারা হয়তো আমাদের স্বপ্নের 'তাবীর' হবে।

এ কথা সত্য যে, এ কচিপাতা-মুকুল-কলিগুলো এতই কোমল ও দুর্বল যে, বৃদ্ধা ও তর্জনীর আলতো ঘর্ষণেই তারা নিমিষে অস্তিত্ব হারাবে, হারানোর উপক্রম হবে। কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, এ কোমল

ও দুর্বল পদার্থগুলো শীতের প্রচণ্ডতাকে ডিঙ্গিয়ে, ঘন কুয়াশায় ঘেরা পৃথিবীতে অন্ধকার ভেদ করে চোখ মেলেছে। তারা বসন্তের উপহার নয়; বরং তারাই বসন্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা বসন্তের হাওয়ায় চোখ মেলেনি; তারা বসন্তের আগমনের পথ সুগম করেছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম রহমত, দয়া, কৃপা, ক্ষমা, রিযক, আশ্রয়, ভালোবাসা, নিরাপত্তা এ দুর্বল ও কোমল কাফেলাটির উপর অঝোর ধারায় শত-হাজার-লক্ষ-কোটি নালিতে প্রবাহিত করে দিন। আমীন।

﴿اللهم إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা

আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ -২

দারুল উলূম দেওবন্দ -এর শত্রু-মিত্র

'দারুল উলূম দেওবন্দ -এর শত্রু-মিত্র' বইটি প্রকাশিত হয়েছে এখনো এক মাস অতিক্রম হয়নি। এরই মধ্যে এর ভাগ্যে তাই জুটেছে যা সিরিজ-১ এর ভাগ্যে জুটেছিল। অস্পষ্ট ধাক্কা। সেই আদি ও আসল উক্তিসমূহ। নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য বড়দেরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা। আকাবিরে উম্মতের হাজার হাজার শুদ্ধকে উপেক্ষা করে দুয়েকটি ভুলকে নিজেদের দুর্বলতার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা। নিজের পক্ষে কাজে লাগলে আয়াত, হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্তকে পেশ করা, আর নিজের সামান্য স্বার্থের বিপরীত হলে কুরআন, হাদীস, ফিকহের সকল সিদ্ধান্তকে চোখ বন্ধ করে বাম হাতে ঠেলে দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি চলছে মহাসমারোহে। সবই আগের মত।

অতিরিক্ত মাত্রা যোগ হয়েছে শুধুমাত্র একটি। তা হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিগত দুর্বলতা। লেখকের ব্যক্তিগত দুর্বলতায় হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে পরীক্ষা চলছে। আপাতত লেখকের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো নাড়াচাড়া দিয়ে দেখা হচ্ছে। লেখক কোন কোন জামাতে ফেল করেছেন? কতবার বিতাড়িত হয়েছেন? কতবার ধরা খেয়েছেন? এসবের হিসাব-নিকাশ। সামনে হয়তো আসবে সামাজিক দুর্বলতা, এরপর পারিবারিক দুর্বলতা, এরপর হাড়ি পাতিলের দুর্বলতা। এরপর ভাতের লোকমা ধরা ও লুঙ্গি পরার দুর্বলতা। এরপর? এরপর কী হবে?

লক্ষণ ভালো নয়। আমরা কোনভাবেই সমস্যাগুলোকে সমস্যা বলতে রাজি হচ্ছি না। সমস্যার মাত্রা অনুভব করার চেষ্টা করছি না। যে কোন শিরনামেই হোক আর যে কোন অজুহাতেই হোক আমরা সমস্যাকে ঢেকে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছি। সমস্যাকে আপন জায়গায় বহাল তবিয়তে রেখে সামনে বাড়ার চেষ্টা করছি।

নিজেদের অন্যায়গুলো থেকে ফিরে আসার কোন চিন্তা করছি না। ভুলের যে কম্বল গায়ে জড়িয়েছি তা কোনভাবেই ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। তালিবুল

ইলমদের সামনে ও প্রজন্মের সামনে ধরা পড়ার ভয়ে আমরা আল্লাহর কাছে ধরা পড়ার কথা ভুলে গিয়েছি। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

কিন্তু সত্যকে স্বীকার না করলে মনে হয় আমরা দু'জায়গায়ই ধরা পড়ে যাব। এক প্রজন্ম ছেড়ে দিলেও আরেক প্রজন্ম ছাড়বে না। আরেক প্রজন্ম ছেড়ে দিলেও তার পরবর্তী প্রজন্ম ছাড়বে না। আমি ও আমরা প্রজন্মের জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে যেতে পারছি না। পারব না। বিগত কয়েক প্রজন্ম ছেড়ে দিয়েছে বলে এ প্রজন্মও ছেড়ে দেবে, সামনের প্রজন্মও ছেড়ে দেবে এমন আশা করা ভুল হবে। অতীত উম্মতের কোন বড়র কোন ভুলকেই কেউ ছেড়ে দেয়নি। এখনো ছাড়ছে না, ভবিষ্যতেও ছাড়বে না।

আকাবিরে উম্মতের 'সঠিকে'র সামনে 'ভুল' একেবারেই নগন্য এবং তার ওজরও গ্রহণযোগ্য। কিন্ত আকাবিরের সামান্য ভুলকে পুঁজি করে আমরা ভুলের যে প্রাসাদ তৈরি করে চলেছি তার সামনে সঠিক একেবারেই নগন্য। আমাদের কোন গ্রহণযোগ্য ওযরও নেই। যাইহোক পাঠকের ভাবনা ও অনুভূতি পাঠকের সামনে থাকা চাই। নেতিবাচক ভাবনাগুলোই সামনে থাকা বেশি জরুরী। ইতিবাচক অনুভূতিতে পাঠকের কোন কাজ নেই। সেগুলো আমার জন্য। নেতিবাচক অনুভূতিগুলো বিবেচনার বিষয়। ভুলগুলো শুদ্ধ হওয়া দরকার। ভুল যে দিকেই থাকুক শুদ্ধ হওয়া দরকার। শরীরের একটি অঙ্গকে যথাসাধ্যা বাঁচানোর চেষ্টাই করা চাই, সে অঙ্গ যত ছোটই হোক। যে কোন ছোট অঙ্গের জ্বালা যন্ত্রণায় পুরো শরীর অস্থির হয়ে উঠতে পারে। বাঁকা পথে হাঁটার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে ভালো হবে। বড় ছোট সবার জন্য ভালো হবে।

পাঠকের ভাবনাগুলো সামনে থাকার বড় একটি ফায়দা হচ্ছে, এর দ্বারা দায়িত্বশীলগণ কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন যে, আমরা আসলে কোন দিকে চলছি।

যারা হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের কর্ণধার হয়ে আছেন, লক্ষ লক্ষ তালিবুল ইলমের মুসলিহ হয়ে আছেন এবং কোটি কোটি মুসলমানের রাহবার হওয়ার দাবি করে চলেছেন তাদের চিন্তা ভাবনার গতি প্রকৃতি কী?

একটি ইলমী বিষয়ের জবাবে খিস্তি খেঁউড়, একটি তথ্যের জবাবে গালাগালি, একটি আশংকার জবাবে তিরস্কার, একটি আবেদন নিবেদনের জবাবে চড়-থাপ্পড়-লাথি, একটি সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতির জবাবে অন্ধকারে ঢিল ছোড়া -এভাবে সমস্যার সমাধান কতটুকু সম্ভব? দ্বীন ও ইলমের একজন

দায়িত্বশীলের এর পরবর্তী দায়িত্ব কী হওয়া উচিত? ইলমীভাবে উদ্ধৃতি ও তথ্যভিত্তিক আবেদন নিবেদন যারা সহ্য করতে পারে না তারা কি এর পরবর্তী পদ্ধতি সহ্য করার মত হিম্মত রাখে?

মন্তব্যকারীদের নামগুলো অস্পষ্ট রাখলাম। প্রয়োজনে স্পষ্ট করার সুযোগ হাতে থাকল। কিন্তু স্পষ্ট করে দিলে আর অস্পষ্ট করার সুযোগ থাকবে না। এরপরও মন্তব্যকারী বা পাঠকের বেশি রকমের আপত্তি থাকলে নাম ঠিকানা লিখে দেব ইনশাআল্লাহ। নাম ঠিকানাসহ মূল কপি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।

➢ **পাঠক:** মুফতী ...... সাহেব, মুশরিফ আততাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা, জামেয়া .... ঢাকা। (ছাত্র যামানায় আমার চাইতে অনেক ভালো ছাত্র ছিলেন, এখনতো তাঁর বড়ত্বের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার কথা ভাবাটাই বেয়াদবির শামিল।)

ভাবনা: উনি আসলে কি বলতে চান? স্পষ্ট করে বলছেন না কেন? আচ্ছা, আমরা যদি উনাকে নিয়ে বসতে চাই এবং আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে চাই তাহলে কি উনি আমাদের সাথে বসতে রাজি হবেন? আমি এবং ...... সাহেবসহ আরো কয়েকজন মিলে যদি একটি মাজলিসের ব্যবস্থা করি তাহলে কি উনি আসতে রাজি হবেন?

লেখকের জবানবন্দি: আমি যা বলতে চাই তার সব স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছি। আর যে কথাগুলো সাধারণ মানুষের সামনে আসার উপযোগী নয় সেসব কথা এবং এ বিষয়ক সকল নথি পত্র ইলমের উচ্চ আদালতে জমা দিয়ে রেখেছি। আমি যা বলছি ও লিখছি তার অতিরিক্ত আর কোন কথা আমার মনে নেই। আমাকে বোঝার জন্য আমাকে আর ডাকার দরকার নেই। যে টেবিলে আমি নথিপত্র সব জমা দিয়ে এসেছি সেখানে যোগাযোগ করলেই হবে। ইনশাআল্লাহ।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: পুরো কিতাব ভুলে ভরপুর। শত্রু'র মাত্রা থেকে নিয়ে জায়গায় জায়গায় প্রচুর পরিমাণে ভুল।

লেখকের জবানবন্দি: জাযাকাল্লাহ! মাত্রা ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। বাকি সকল ভুলের নমুনা যদি 'মাত্রা'র মত হয় তাহলে আশা করি এ বই পড়ে উম্মত কমপক্ষে গোমরাহ হবে না। ভেবেছিলাম, শত্রুকে মাত্রাশূন্য করে

ছাড়ব। কিন্তু পাঠক রাজি না হলে শত্রুর মাথায় 'মাত্রা'র ছায়া রেখেই কাজ করতে হবে। আখের পাঠক ছাড়া তো আর লেখক লেখক হতে পারে না।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারম

ভাবনা: (দরসে তালিবুল ইলমদেরকে উদ্দেশ্য করে), 'তোমাদের মধ্যে যে এ কিতাব পুরো পড়েছে আমি তাকে নিজ খরচে পাবনা পাঠাব'।

লেখকের জবানবন্দি: মুফতী সাহেব হুজুর এ অফার কি পুরা বই পড়ার আগে দিয়েছেন? না কি পরে দিয়েছেন? আগে দিয়ে থাকলে এ অফারের ব্যাপারে ফাতওয়ার কিতাবে কী লেখে? আর পরে দিয়ে থাকলে এ অফার গ্রহণ করার অধিকার সবার আগে কে পাবেন? এ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব পাঠকের কাছেই থাকুক।

আমার অপরাধ, আমি সমস্যার সমাধান চেয়েছি।

মুফতী সাহেবের দরবারে আমি আরেকটি নিবেদনও করতে চাই, আমাদের এত কঠিন তীর্যক মন্তব্য কি আসলে প্রজন্ম সহ্য করতে পারবে? খোদ আমার/আপনার দুই বছরের সোহবতপ্রাপ্ত শাগরেদও কি সহ্য করতে পারবে? এ শাগরেদরা কি শুধু আমার/আপনারই শাগরেদ না কি আরো মানুষেরও শাগরেদ? শাগরেদরা কি আমাদের বাতলানো পৃষ্ঠাগুলো উল্টায় না কি এর বাইরে আরো পৃষ্ঠাও উল্টায়? কথাগুলো মুফতী সাহেবদের মনে থাকলে ভালো।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: এসব ব্যবসা। লিখছে, আর টাকা পাচ্ছে। তার তো কোন সমস্যা নেই।

লেখকের জবানবন্দি: ব্যবসা দুই রকম হতে পারে। **এক.** বই বিক্রয় করে ব্যবসা। **দুই.** দালালির ব্যবসা।

প্রথমটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে মন্তব্য সঠিক। বাকি হিংসা করার কোন প্রয়োজন নেই। বেশি লাভজনক মনে হলে শরীক হতে পারবেন। বইগুলোর কোন স্বত্বাধিকার রাখা হয়নি। সবার জন্য এ ব্যবসা উম্মুক্ত রাখা হয়েছে। বরং ব্যবসা সবার জন্য উম্মুক্ত রাখার কারণেও ভর্ৎসনা শুনোছি।

আর যদি দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এর বিশ্বাসযোগ্য কোন জবাব আমার কাছে নেই। তাই কোন প্রকার মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলাম। কিন্তু যে কথাটা বলতেই হবে তা হচ্ছে, এ সন্দেহের ভিত্তিতে যিম্মাদারী থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

আমার আরো নিবেদন হচ্ছে, কারো দালালি করা ছাড়া বা কারো খপ্পরে পড়ার আগে কি এ বিষয়গুলো আমদের দায়িত্বের আওতায় আসার কোন সুযোগ নেই? খপ্পরে পড়ার আশংকা কি উপস্থাপিত তথ্যগুলোকে একেবারে নিষ্প্রাণ করে দেবে? তথ্যগুলোর কি নিজস্ব কোন ভাষা ও আবেদন নেই? যা একজন দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্বের প্রতি ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারে। সমস্যাগুলোর কি নিজস্ব কোন শক্তি নেই? যা একজন ওয়ারেসে নবীকে তার মীরাস রক্ষার প্রতি সতর্ক করে তুলতে পারে।

➢ **পাঠক:** সহকারী মুফতি .... দামাত বারাকাতুহুম, সাবেক জামেয়া ...... ঢাকা।

ভাবনা: (আততাখাস্‌সুস ফিল ফিকহী ওয়াল ইফতার তালিবুল ইলমদেরকে লক্ষ করে) আপনারা এ কিতাব কেনা-বেচা করবেন না। জানতে চাওয়া হয়েছে, সমস্যা কোথায়? বলা হয়েছে, এটা আপনারা বুঝবেন না। এক্ষুনি কেনার দরকার নেই। (উল্লেখ্য, তিনি বইটি এখনো পড়েননি।)

লেখকের জবানবন্দি: তাখাসসুসের তালিবুল ইলমদের ব্যাপারে এতটা খারাপ ধারণা করা মনে হয় ঠিক হবে না।

➢ **পাঠক:** মুফতী ...... দামাত বারাকাতুহুম, মুশরিফ, ফিকহ বিভাগ, জামেয়া ...... মাদরাসা, ঢাকা।

ভাবনা: (ছাত্রদের হাতে কিতাব দেখতে পেয়ে) আপনারা কেউ এ কিতাব পড়বেন না। সমস্যার বিষয়গুলো অন্য সময় বলব।

লেখকের জবানবন্দি: পড়তে দিলেই ভালো হত। সমস্যাগুলো এবং সমস্যা সৃষ্টিকারী হাতেনাতে ধরা পড়ে যেত। গণধোলাই সহজে বৈধতা পেত।

➢ **পাঠক:** মুফতি .... সাহেব, ... মাদরাসা ঢাকা। সেরা মাদরাসার একটি। আমাকে অনেক মুহাব্বত করতেন। জরুরী জরুরী বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতাও এক সময় করেছেন। তিনি আমাকে অনেক কাছে থেকে দেখেছেন এবং আমাকে জানেন।

ভাবনা: ('মোবাইল চেক' শিরোনামে তালিবুল ইলমদের ট্রাংক তল্লাশি করার পর বইটি পেয়ে) 'মনে রাখবে খায়রুল কুরূনেও খারেজী ছিল একালেও খারেজী আছে। এ কথা মনে করো না যে, আজকাল খারেজী বলতে কিছু নেই'।

লেখকের জবানবন্দি: বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানদের প্রতিটি দল উপদলই অপর দল উপদলের দৃষ্টিতে খারেজী অথবা ইহুদী-খ্রিস্টানদের দালাল

বিশেষণে বিশেষিত। তাই দলিলভিত্তিক সংজ্ঞা সময়ের দাবি। অস্পষ্ট ধাক্কা তালিবুল ইলমদেরকে আরো বেশি পেরেশান করে তুলবে। আর খারেজী ও দালাল সন্দেহ করে ফরয দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। সমস্যা হচ্ছে, তালিবুল ইলমরা এ কথাগুলোও জানে।

➢ **পাঠক:** কর্তৃপক্ষ ..... মাদরাসা, ঢাকা। সাবেক মুহতারামের মাদরাসা।
ভাবনা: দরসী কিতাবের বাইরে গায়রে দরসী কোন কিতাব রাখা যাবে না। অপ্রত্যাশিতভাবে কারো কাছে যদি কোন গায়রে দরসী কিতাব পাওয়া যায় তাহলে তাকে তাৎক্ষণিক ইখরাজ করা হবে।
লেখকের জবানবন্দি: কানূনটি خص عنه البعض না কি لم يخص عنه البعض ?

خص عنه البعض হলে উসূলুশ শাশীর এ এবারতটুকুও মনে রাখতে হবে-

وأما العام الذي خص عند البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال فإذا أقام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس.

➢ **পাঠক:** .... মুশতারাক সালের তালিবুল ইলম।
ভাবনা: (কিতাব হাতে পাওয়ার পর) ভাই ......, মনে কষ্ট নিও না! ...... সাহেব হুজুর বছরের শুরু থেকে সিরিজের প্রথম বই না পড়ার তাকীদ দিয়ে আসছেন। এ মুহূর্তে আমরা যদি এটা পড়ি বা আমাদের কাছে রেখে দেই তাহলে.............
লেখকের জবানবন্দি: পড়ার অনুমতি চেয়ে লিখিত দরখাস্ত করে দেখা যেতে পারে। অথবা, ফেরাকে বাতেলার মুতালাআ হিসাবে অনুমতি প্রার্থনা করা যেতে পারে। এত বড় ইলমী মারকাযের নেযাম নষ্ট করার পরামর্শ দেয়ার মত হিম্মততো আর আমাদের নেই। তবে আমি বিচারপ্রার্থী।

➢ **পাঠক:** মুফতি .... দামাত বারাকাতুহুম, মাদরাসা ...., ঢাকা। সেরা মাদরাসাগুলোরও সেরা।
ভাবনা: কথা যা বলেছেন সত্য বলেছেন, ভাষা একটু কঠিন করে ফেলেছেন। মানুষ তাহাম্মুল করতে পারবে কি না? আল্লাহই ভালো জানেন।
লেখকের জবানবন্দি: জাযাকাল্লাহ। আমার জানা মতে, এসব বিষয়ে আমাদের সলফের ভাষা আরো অনেক বেশি কঠিন ছিল। কুরআন ও হাদীসের ভাষা তার চাইতেও কঠিন। নমুনা এখানে দিতে চাই না। বাকি

মুহতারাম বা মুহতারামগণ যদি আমাদেরকে ভাষার একটা মাপকাঠি দিয়ে দিতেন তাহলে আমরা উপকৃত হতাম। মনে রাখতে হবে, বিষয়ের ভয়াবহতা সামনে রেখে ভাষার মাপকাঠি ঠিক করতে হবে।

➢ **পাঠক:** দারুল ইফতা'র এক তালিবুল ইলম।

ভাবনা: মুফতি ... সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, উনিও (লেখক) তো এমন মানুষ যাকে চাইলেই বাদ দিয়ে ফেলা যায় না এবং লা-ইলমীও নয়। বরং ইলমীভাবে মারকাযের স্বীকৃত ব্যক্তি। তাহলে তো উনার কথাকে একদম ফেলে দেয়া যায় না।

মুফতি ..... সাহেব: ঠিক আছে, তোমাদেরকে কিতাবুস সিয়ারের যে অংশ মুতালাআ করতে দেয়া হয়েছে তা শেষ করার পরে আমরা এসব বিষয় নিয়ে বসব।

লেখকের জবানবন্দি: কিন্তু সে মুতালাআ ও সে বসার আগেইতো মন্তব্যের পাহাড়ের নিচে আমি চ্যপটা হয়ে গেলাম। এর বিচার কে করবে?

➢ **পাঠক:** মাওলানা .... , ... ফারেগ, নোয়াখালী।

ভাবনা: যুবায়ের সাহেবের আসলে কিছু বুঝতেছি না, তিনি নিজের মতগুলোকে অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। এটা কতটুকু ফলপ্রসু হবে?

লেখকের জবানবন্দি: সে কথাগুলো কি? চিহ্নিত না হলে আমার মত অপদার্থের দ্বারা এ কথা বোঝা সম্ভব নয় যে কোনটি আমার ব্যক্তিগত মত আর কোনটি সবার মত। সবগুলো কথাই আমার কথা, না কি অর্ধেক কথা আমার কথা, না কি কিছু কথা আমার কথা? যেটাই হোক চিহ্নিত না করে দিলে আমি বুঝতে পারব না। আমিতো সবগুলো কথা এ হিসাবেই লিখেছি যে, এগুলো সব সবার কথা। আমার ভুল আমি ধরতে পারব না। কমপক্ষে এ দায়িত্বটি পাঠককেই নিতে হবে। আমার সব কথা আমি প্রকাশ করে দিয়েছি। আমার ভুল ধরা একেবারেই সহজ। কোন অজুহাতের প্রয়োজন নেই।

➢ **পাঠক:** মুফতি .... , ... মাদরাসা, ঢাকা। ইলম ও আমলে সেরা মাদরাসার একটি।

ভাবনা: কুরআন-হাদীসের নুসূসগুলো শুধু তিনি একাই বুঝেছেন, আর কেউই বোঝেনি? এত বড় বড় উলামায়ে কেরাম থাকতে তিনি একাই বুঝেছেন। এরা বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার হামেল। পুরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত একদিকে আর তিনি একদিকে।

লেখকের জবানবন্দি: না, আমি ছাড়া বাকি সবাই এক দিকে নয়। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ দিকেই চলছে। আমরা সাধারণত একজনকে দুর্বল করার জন্য এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে থাকি যে, তিনি একা সবার বিপরীত বলছেন। আমার বক্তব্যের উপর যে উদ্ধৃতিগুলো রয়েছে সেগুলোর বক্তাতো আমি নই, আরেক জন। আমি একা বুঝলেতো কোন উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল না।
যাইহোক ভুলগুলো চিহ্নিত না করলে সমস্যা বড়তেই থাকবে। আর এর দায় দায়িত্ব অপদার্থের চাইতে পদার্থদের উপরই বেশি আসবে।

➢ **পাঠক:** আল্লামা ..... হাফিযাহুল্লাহ, ... ঢাকা। ইলমের ময়দানে আমার মুহসিন, যে ইলমকে আমি এখন অপব্যবহার করে চলেছি বলে তাঁর ধারণা।
ভাবনা: উনি কেন সবগুলো কথায় আমাকে টার্গেট করেছেন? আমি কি করেছি?
লেখকের জবানবন্দি: আমার প্রথম বইয়ের উপর একজন মন্তব্য করেছিলেন, 'যুবায়ের মামা একটা বই লিখেছেন, বইটা যেই পড়বে তারই মনে হবে বইটি তার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে'। এ মন্তব্য অনেক পুরাতন। এ মন্তব্য সম্পর্কে তখন আমি এ কথাও বলেছি যে, খোদ লেখকও বইটি পড়লে তার কাছে মনে হয়, বইয়ের সবগুলো কথা লেখকের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। এ জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি সমস্যার বিরুদ্ধে লিখেছি। যার মাঝে সমস্যা নেই এ লেখা তাকে আঘাত করার কোন সুযোগ নেই।

➢ **পাঠক:** ...... উচ্চতর ইলমের এক তালিবুল ইলম।
ভাবনা: (কিতাবটি হাতে পেয়ে, যে তালিবুল ইলম পাঠিয়েছে তাকে উদ্দেশ্য করে) কি বুঝে সে এখানে কিতাব পাঠিয়েছে? এতটুকু জ্ঞানও কি তার নেই? কোথায় কিতাব পাঠাবে আর কোথায় পাঠাবে না তা কি সে বোঝে না? কি আশ্চর্য ব্যাপার!!
লেখকের জবানবন্দি: লেখকেরই এখনো সে বুঝ হয়নি, বাহক আর প্রেরকের সে বুঝ থাকবে -এমনটা আশা করা একটু বেশি হয়ে যায়। এ অবাক হওয়াটা একেবারে বাজে খরচ হল। যে বইয়ের লেখক ভাসমান সে বইয়ের বাহক ও প্রেরক উড়ন্ত খড়কুটা হলে গভীরের মানুষরা কেন যে অবাক হয় বুঝতে পারি না। আমাদের অবুঝের মেয়াদ আর কত দীর্ঘ হবে?!

➢ **পাঠক:** এক নদভী, লেখক, সাহিত্যিক, কলামিষ্ট।

ভাবনা: এ কিতাব বড়দের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করবে, এমনকি ‘বদ আসর’ পড়বে -এ ভয়ে উক্ত কিতাব আমার ঘরে রাখাকেও পছন্দ করিনি, বরং আমি আমার সংগ্রহে থাকা কপিটি ঘর থেকে নিয়ে গেছি।
লেখকের জবানবন্দি: দূর অতীত থেকে আজো পর্যন্ত এ পদ্ধতির বা এর চাইতে কঠিন বহু কাজ হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। সেগুলোর দ্বারা কখনো বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়নি। আমার মনে হয়, যারা বড়দের নাম বিক্রয় করে চলার চেষ্টা করছে তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টি হবে। বড়দের নাম ভাঙ্গিয়ে যারা হীন স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় তারা ধরা পড়ে যাবে এবং যাচ্ছে। বড়দের হাজার শুদ্ধকে উপেক্ষা করে যারা বড়দের দুয়েকটি ভুলের উদ্ধৃতি দিয়ে পুল পার হওয়ার চেষ্টা করছে তারা ধরা পড়ে যাবে এবং যাচ্ছে।
আর কার কার কোন কোন লেখায় কী কী বদ আসর সৃষ্টি হচ্ছে সে তালিকাও আমাদের কাছে তৈরি আছে। ইনশাআল্লাহ লেখা ও লেখকের ছবি এক সঙ্গেই প্রকাশিত হবে।

➢ **পাঠক:** মুহতারাম মাওলানা ...... দামাত বারাকাতুহুম, মুশরিফ, উলূমুল হাদীস বিভাগ, ... মাদরাসা ঢাকা।
ভাবনা: এতে উম্মতের কী ফায়েদা হবে? বরং এখন প্রয়োজন ছিল, ‘হাম ফিকরের লোক তৈরী করা’। কাজটা তিনি পরেও করতে পারতেন।
লেখকের জবানবন্দি: প্রথম ফায়দা হল, আমার যিম্মাদারী আদায় হবে। **দ্বিতীয়** ফায়দা হল, যাদের মধ্যে সহীহ বুঝ গ্রহণ করার মানসিকতা আছে তারা ভুল থেকে ফিরে আসবে এবং যতটুকু খবর পাচ্ছি ফিরে আসছে। **তৃতীয়** ফায়দা হল, ধোঁকা খাওয়ার পরিধি কমার মত ব্যবস্থা হবে। **চতুর্থ** ফায়দা হল, খাবিস ও তাইয়িবের তাময়ীয হবে। **পঞ্চম** ফায়দা হল, আমার পদ্ধতির মাঝে যে ভুলগুলো আছে সেগুলোকে পরিহার করে ভুলমুক্ত কাজ করার মত লোক ময়দানে বেরিয়ে আসবে। **ষষ্ঠ** ফায়দা হল, আমার ভুল ধরে ধরে হলেও উম্মত ভুলকে ভুল বলতে শিখছে। উম্মতের জন্য এ অনুশীলনটি খুব দরকার ছিল। **সপ্তম** ফায়দা হল, এর দ্বারা তালিবুল ইলমরা বুঝতে পারল, ঘরের লোকদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা দরকার। তারা একটু অতিরিক্ত সতর্ক হল। **অষ্টম** ফায়দা হল, ঘরের লোকদের গোমরাহী ধরার একটা অনুশীলন তারা করতে পারল। **নবম** ফায়দা হল, ঘরের লোক হলেই ছেড়ে দিতে হবে, বিষয়টি এমন নয়। তাঁর নাম যুবায়ের হোক আর যাই হোক। **দশম** ফায়দা হল, সবাই বুঝতে পারল এক দুই যুবায়ের কোন

ভাবার বিষয় নয়, ভাবার বিষয় হচ্ছে, দ্বীন ও ইলমে দ্বীন। এভাবে আরো বহু নম্বরও হয়তো খুঁজলে বের হবে। আপাতত এতটুকুই থাকুক।
আর কাজটি নিশ্চয় মৃত্যুর পরে করা সম্ভব হবে না। সুতরাং মৃত্যুর আগের সে সময়টি, সে পর্বটি কোনটি যে সময়ের জন্য বা যে পর্বের জন্য আমি অপেক্ষা করতে পারি?
আর 'হাম ফিকরের লোক তৈরি করা'র জন্য আমি কত বছর ব্যয় করেছি এবং কতভাবে করেছি সে কথা আমি এ মুহতারামকে বলেছি। কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। এছাড়া 'হাম ফিকর'টা এখনো নির্ধারনই করা যাচ্ছে না এবং সে বিষয়ে সিদ্ধান্তেও পৌঁছা যাচ্ছে না।

➢ **পাঠক:** মুহতারাম মাওলানা ...... দামাত বারাকাতুহুম, সহকারী, উলূমুল হাদীস বিভাগ, ... মাদরাসা ঢাকা।
ভাবনা: কাজটা যদি সঠিক হত তাহলে মারকাযও এ মানহাজকেই গ্রহণ করত।
লেখকের জবানবন্দি: মারকায কর্তৃপক্ষতো এ কথা মানতে রাজি নয়। সব সঠিককে সঠিক বলা এবং সব বেঠিককে বেঠিক বলা মারকাযের দায়িত্ব -এ দাবি আমি ও আমরা মারকাযের কাছে করেছি। মারকায এ কথা মানতে রাজি হয়নি। আর মারকাযের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যেসব কাজ হয়েছে সেগুলোর মূল মানহাজের সঙ্গে আমাদের মানহাজের ফরক কতটুকু উদাহরণসহ মেপেই পরে এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে।
আমার কাছে উদাহরণ আছে। মানহাজে মানহাজে বড় রকমের কোন ব্যবধান মনে হয়নি। উদাহরণ আর ক্ষেত্র নির্বাচনে ব্যবধান হয়েছে। আর আগেই বলেছি, মারকায সকল উদাহরণ ও সকল ক্ষেত্রের দায়িত্ব নিতে রাজি হয়নি। আর মানহাজে মানহাজে যতটুকু ব্যবধান আছে ততটুকু উসূলুদ দাওয়াহ, আহকামুদ দাওয়াহ, আহকামুল আমর বিল মা'রূফ ওয়া আহকামুন নাহয়ি আনিল মুনকার ও উসূলুল ফিকহের আলোকে বিচার করলে এ বিষয়ে আমরা হয়ত আরেকটু অগ্রসর হতে পারব।

➢ **পাঠক:** মুহতারাম মাওলানা .... দামাত বারাকাতুহুম, ... মাদরাসা ঢাকা। ।
ভাবনা: কী ফায়েদা হল? এখন তো তাঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
লেখকের জবানবন্দি: যদি মেনে নেই যে লুকিয়ে আছি তা হলে কি কোন ফায়দা হয়নি? লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়ানো কি কোন কাজের তালিকায়

আসে না? শত্রুর ভয়ে লুকিয়ে থাকা কি খুব নতুন বিষয় মনে হয়? কাজ করা, কাজ করতে গিয়ে শত্রুর রোষানলে পতিত হওয়া, রোষানলে পতিত হয়ে আক্রান্ত হওয়া, আক্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য লুকিয়ে থাকা -এসব কিছুকে আমি কাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছি।

শত্রুর ভয়ে রাতের অন্ধকারে নিজের আবাসন থেকে বের হয়ে যাওয়া, শত্রুর ভয়ে পাহড়ের গর্তে লুকিয়ে থাকা, শত্রুর ভয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া, শত্রুর ভয়ে নিজের স্ত্রী-সন্তানদেরকে ঝুকির মুখে ফেলে লুকিয়ে যাওয়া, শত্রুর ভয়ে বালু ও পাথরকে বিছানা বানানো, শত্রুর তাড়নায় বছরের পর বছর পাহাড়ী উপত্যকায় আবদ্ধ থকা -এগুলোকে আমি আমল মনে করেছিলাম। অপরাধের প্রতিরোধ করতে গিয়ে فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ কে আমি উসওয়া মনে করেছিলাম।

মঙ্গলকামীদের দৃষ্টিতে যদি এগুলো সব অন্যায় হয় তাহলে ঝুকিমুক্ত নিরাপদ ধর্মাচারে আবার ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দলিল ছাড়া তা করি কীভাবে? দলিলকে উপেক্ষা করি কীভাবে? সীরাতে মুহাম্মদ ও সীরাতে আম্বিয়াকে উপেক্ষা করি কীভাবে? সীরাতে সাহাবা, সীরাতে আকাবির উপেক্ষা করি কীভাবে? হতে পারে সে ইতিহাস অনেক পুরাতন। কিন্তু সে ইতিহাস যে উসওয়া। সে ইতিহাস যে আদর্শ। সে ইতিহাস যে প্রেরণা। সে ইতিহাসের যে কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু এসবের জবাবেও যদি মুহতারাম বলে বসেন, সব শুধু আপনারাই বুঝেছেন! আর কেউ বোঝেনি! তাহলে আমি আবারও লা'জবাব।

➢ **পাঠক:** মুফতী ...., সহকারী দারুল ইক্বামা, ... মাদরাসা, না. গঞ্জ।

ভাবনা: এ যে যুবায়ের, তোমরা চিনো ওকে? সে মারকাযের হাদিস বিভাগে আব্দুল মালেক সাহেবের সহকারী ছিল। তার এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে ওখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এ দুঃখে সে এখন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আকাবিরদের ভুল খুঁজে বেড়াচ্ছে। (শ্রোতাদের ধারনা, বক্তা উক্ত বক্তব্যটি প্রথম মুহতারাম সাহেবের কাছ থেকে শুনেছেন)

লেখকের জবানবন্দি: এ বিষয়ে শায়খ আব্দুল মালেক সাহেব ও মুফতী আব্দুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সবচাইতে ভালো হবে। এ বিষয়ে আমি যাই বলব তাই ভুল হবে। আর আমি বললে এমন কিছুই বলার চেষ্টা করব যার দ্বারা আমার নির্দোষিতা প্রকাশ পাবে, ইজ্জতের কাল্পনিক অংশটুকু রক্ষা পাবে। সুতরাং আমার দেয়া জবানবন্দি এখানে অসত্য হওয়ার

আশংকা শতভাগ। পাঠক প্রয়োজন মনে করলে এ বিষয়ে মারকায কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হতে পারেন। দ্বীনের স্বার্থে মারকায যে কোন তথ্য দিতে এবং যে কোন ঘোষণা দিতে কোন বাধা আছে বলে আমার মনে হয় না।
আর দুঃখ ও প্রতিশোধ সম্পর্কে বলতে পারি, এগুলো সত্য হলেও আখের এগুলো আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা লেখার কারণ। কিন্তু উত্থাপতি সমস্যার সমাধান কী? প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাব কী?
ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমার উপর অভিযোগাকারীরা বাদী হিসাবে অনেক বড়, আর বিবাদী হিসাবে আমি ঠিক সে পরিমাণ ছোট। বাদী আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা যে পরিমাণ জানে তার চাইতে অনেক বেশি আমি জানি। তাই এ মামলায় যে আমি হেরে যাব এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তাই ব্যক্তিগত দুর্বলতা নিয়ে আমি কোন মামলায় লড়তে রাজি নই। আমার পক্ষে কোন সাক্ষী সুবুত দাঁড় করাতেও রাজি নই। কোন প্রকার কারীনায়ে কারীবা বায়ীদাও পেশ করতে রাজি নই। এবং আমি তা পারবও না। তাই আমি হেরে গেলাম।
কিন্তু সমস্যার সমাধান কী?
আমি চুরি করতে গিয়ে যদি কারো ডাকাতি দেখে ফেলি এবং ডাকাতি প্রমাণিতও হয়ে যায় তাহলে আমার চুরির অপরাধে কি ডাকাতির বিচার মুলতবি থাকবে? ডাকাতি বৈধতা পাবে?
উত্থাপিত তথ্য ও বাস্তব সমস্যার সমাধান কী?

- **পাঠক:** ..... সাহেব, মুহতামিম, জামেয়া .... না. গঞ্জ।

ভাবনা: (...... না. গঞ্জ -এর মুহতামিম মাসজিদে ঘোষণা দিয়েছেন) আমাদের এখানকার ইফতা বিভাগের মুশরিফ মুফতি .... সাহেব (প্রথম মন্তব্যকারী) বলেছেন ‘এ কিতাব পুড়িয়ে ফেলা দরকার’।
লেখকের জবানবন্দি: কেন পুড়িয়ে ফেলা দরকার সে কথা মুহতামিম সাহেবও বলেননি, মুশরিফ সাহেবও বলেননি। অস্পষ্ট কিছু বলে থাকলেও তা দেখিয়ে দেননি। এখন কোন তালিবুল ইলম যদি মনে করে বসে যে, এ বইয়ের কারণে মুহতামিম সাহেবেরও সমস্যা হচ্ছে এবং মুশরিফ সাহেবেরও সমস্যা হচ্ছে। তাই পুড়িয়ে ফেলা দরকার। কারণ ব্যাখ্যা না করলে তালিবুল ইলমরা নিজের মত করে এমন কিছু বুঝে নিতেই পারে। কিছু করার নাই। এ জন্য লেখকের কি করার আছে!

➢ **পাঠক:** মুফতি .... সাহেব, সহকারী দারুল ইক্বামা, ... মাদরাসা, না. গঞ্জ ।

ভাবনা: বড় হুজুরের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বইয়ের ভেতরে কী আছে -এ মানসে আমি বইটি পড়ে দেখলাম। কিন্তু কয়েক পাতা পড়ার পর বুঝতে পারলাম যে, এ উদ্দেশ্যেও আমার পড়া ঠিক হয়নি। কারণ আসলে কিছু কথা এমন আছে যা বাস্তবেই আকর্ষণ করে। তাই আর বাকি পৃষ্ঠাগুলো উল্টাইনি।

লেখকের জবানবন্দি: মুহতারাম খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন। বাকি পৃষ্ঠাগুলো উল্টালে মুহতারাম বড় রকমের দ্বিমুখী সমস্যায় পড়ে যেতেন। বড় হুজুর কেন নিষেধ করেছেন তা খুঁজতে খুঁজতে পৃষ্ঠাগুলোর বারটা বেজে যেত, কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণ পাওয়া যেত না।

আর যদি কারণ বুঝেই ফেলতেন তা হলে সমস্যা আরো প্রকট রূপ ধারন করত। কাকে ছাড়বেন কাকে ধরবেন এ পেরেশানীতে পড়ে যেতেন। না পড়ার কারণে এখন ভারি ভারি এবারত ব্যবহার করা যাবে। নসীহতমূলক বাক্য ব্যবহার করা যাবে। কোন প্রকার কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: (তালিবুল ইলমদের সকল বই জমা নিয়ে) উপকারী-অনুপকারী সকল বই জমা নেয়া হয়েছে, শুধু মাত্র ১. আল্লাহ ওয়ালার সোহবত, ২. ....প্রকাশনা'র বই ৩. মাসনূন দোয়া, ৪. সফল তালিবুল ইলমসহ আমাদের ....য়ার আসাতিযায়ে কেরামের আরো যেসব বই আছে এগুলো নিজেদের কাছে রাখতে পারবে।

লেখকের জবানবন্দী: যে বইগুলো পড়ার অনুমতি পাওয়া গেছে সে বইগুলোর লেখকবৃন্দ কি আকাবির, মুত্তাফাক আলাইহি আকাবির এবং মাসূম আকাবির? এভাবেতো মাসূম আকাবিরের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। তখন দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির ওলামায়ে কেরামতো কোন সিরিয়ালই পাবেন না।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: (ব্যাপক তল্লাশীর পর) কিরে! তোদের কাছে কি দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু-মিত্র বইটি নেই? সব এতটাই বুযুর্গ? এই বইয়ের লেখক হচ্ছে যুবায়ের। তার পরিচয় জানিস? ও মারকাযুদ্দাওয়ার উলূমুল হাদীস বিভাগের আব্দুল মালেক সাহেবের সহকারী উস্তায। নয় বছর আগে ওকে

ওখান থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই জন্য এই দুঃখে সে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আলেমদের বদনাম করে বেড়াচ্ছে।

লেখকের জবানবন্দী: প্রথমত আমাদের বইটি না রাখা বুযুর্গ হওয়ার একটি আলামত হল। এটা একটা ভালো কথা। এ লেখককে বহিষ্কার (?) করা হয়েছে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে। এ হিসাবে এখন ১১/১২ বছর হয়ে গেছে। বছরের সঠিক সংখ্যাটা জানা থাকলে ভালো হবে। এগার/বার বছর আগের দুঃখ প্রকাশ করতে এত দেরি হল কেন সে কথাটাও একান্ত বাধ্য শাগরেদদেরকে বুঝিয়ে দিলে তারা বাড়তি শুকরিয়া আদায় করতে পারত।
আর ইলমের মারকাযের প্রতিশোধ ইলমের মারকাযের কাছ থেকে না নিয়ে খানকাহ ও রাজনীতির কেন্দ্র থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ভেদ রহস্যটা বুঝিয়ে দিলেও ভক্ত মুরিদরা আশ্বস্ত হতে পারত।
বিগত এগার/বার বছর যাবত সে ক্ষোভ আর কোন কোনভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার একটা তালিকা সংগ্রহ করতে পারলেও পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে কাজে লাগাতে পারবেন। বাধ্য শাগরেদদের সন্দেহ কাটাতে সহজ হবে।

- **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: আমি প্রথমে মনে করেছি, শত্রু মানে হল ইহুদী-খ্রিস্টান আর মিত্র মানে হল আমরা ওলামায়ে দেওবন্দ। এখন দেখি তার মতে সমস্ত ওলামায়ে দেওবন্দরা হল শত্রু, আর তার মত বাটপার-চিৎপুটিরা হল মিত্র।

লেখকের জবানবন্দী: হুজুর কি খুব বেশি রকম রেগে গেলেন? গালাগালি করার পর মনে কিছুটা স্থিরতা আসে। দায়িত্বের আংশিক হলেও আদায় হয়েছে বলে মনে হয়। তাই আশা করি আপনি এখন শান্ত আছেন, তাই বলছি-
আমি কিছু সমস্যা তুলে ধরেছি। প্রথমে একটু দেখবেন সমস্যাগুলো সমস্যা কি না? যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে যাদের মাঝে এ সমস্যাগুলো নেই তারা দেওবন্দের শত্রু হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এমন কি যাদের মাঝে সমস্যাগুলো আছে তারাও নিশ্চিতভাবে দেওবন্দের শত্রু নয়। তবে সমস্যা সমস্যা নয় এ কথা বলারও কোন সুযোগ নেই।
সমস্যা যে দেখিয়ে দেবে তার কপালে যে বিশেষণই জুটুক না কেন সমস্যা আখের সমস্যাই। সমস্যা কখনো গর্বের বিষয় নয়। ধামাচাপা দেয়ার বিষয় নয়। সমস্যাকে সমস্যা বললেই কোন না কোন দিন সমস্যা থেকে নিস্তারের আশা থাকে। আর না হয় সে আশাটুকুও মিলিয়ে যায়।

আর চিৎপুটি মানে যদি হয়, মরে চিৎ হয়ে যাওয়া পুঁটি মাছ তাহলে আপনার এ মতের সঙ্গে আমার দ্বিমত আছে। কারণ আমি এখনো মরে যাইনি। আর যদি এর অর্থ হয় ছোট পুঁটি মাছ তাহলে আপনার উপহারটি যথার্থ হয়েছে। তবে ছোট পুঁটি না বলে আরো ছোট যে মাছগুলো আছে সেগুলোর নামও বলতে পারতেন, কারণ আমি আরো ছোট, যেগুলোর ঝাঁকও হাঙ্গরের এক ছোট্ট গ্রাস মাত্র।

আর যদি শব্দটি 'চুনোপুঁটি' হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি একেবারেই সহজ। তবে এখানে বর্ণনাকারীরও কোন কারসাজি থাকতে পারে।

মনে পড়ে, আমার মুদ্রিত লেখার সূচনাপর্বে আহলে হাদীস দাবিদারদের বাংলাদেশী মাযহাবসমূহের এক মাযহাবের ইমাম (?) ড. আসাদুল্লাহ আলগালিব -এর ডক্টরেট থিসিসের একটি সুস্পষ্ট খেয়ানত আমার লেখায় তুলে ধরেছিলাম। তখন গালিব সাহেব আমাকে 'নর্দমার কিড়া/পোকা' বিশেষণটি উপহার দিয়েছিলেন। সে তুলনায় বর্তমান উপহার হিসাবে বোঝা যায়, আমার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এটা কিন্তু একটা ভালো লক্ষণ।

আমার মত বাটপার ও চিৎপুটির কোন সজ্ঞা বা পরিচয় বইয়ে দেয়া হয়নি। কেউ মিত্র হতে চাইলে তার কোন ব্যবস্থাও এ বইয়ে রাখা হয়নি। তবে শত্রু-মিত্র কীভাবে হবে তার একটি মাপকাঠি বইয়ের শুরুতে দেয়া হয়েছে এবং বইয়ের ভেতরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সে মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে মূলনীতির উপর কোন আপত্তি থাকলে তা তালিবুল ইলমদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। এতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। এর দ্বারা আমিও উপকৃত হতে পারব।

আর সত্যকে ঢাকার কোন ব্যবস্থা না থাকলেই যে গালাগালি করতে হয় -এ কথা ছেলেরা জানে। ছেলেরা যে এ কথা জানে তা আমাদের জানা থাকা দরকার।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর একজন মুকাল্লিদ হিসাবে এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি ছোট্ট ঘটনাও এখানে উল্লেখ করব। এর মাঝে আমার জন্য সান্ত্বনা এবং আপনার জন্য নির্দেশনা রয়েছে।

عبد الرزاق قال شهدت أبا حنيفة في مسجد الخيف، فسأله رجل عن شيء فأجابه، فقال رجل: إن الحسن يقول كذا وكذا، قال أبو حنيفة: أخطأ الحسن، قال:

فجاء رجل مغطى الوجه قد عصب على وجهه فقال: أنت تقول أخطأ الحسن يا ابن الزانية! ثم مضى، فما تغير وجهه ولا تلون، ثم قال: إي والله أخطأ الحسن وأصاب ابن مسعود.(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. باب مناقب أبي حنيفة.)

ইমাম আবু হানীফা রহ. ভুল ধরেছিলেন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বসরী রহ. এর। যে হাসান বসরী কারো কারো মুখে সাইয়েদুত তাবেয়ীনের খেতাবও পেয়েছিলেন। গালি খেয়েছিলেন ‘হারামযাদা’। এ গালি খেয়ে ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর আগের কথাটিই আরো শক্ত করে শুনিয়ে দিয়েছেন। আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের পাঠকবর্গ এখনো এত কঠিন গালি শিখেনি।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: কি লিখছে জানস? এই যে বিভিন্ন সময়ে আমরা তোদের কথাবার্তা বলিনা? হে কয়, আমরা নাকি এগুলো বলে তোদের থেকে খেদমত নেই।

লেখকের জবানবন্দী: নিষিদ্ধ হলেও একটি কপি রাখা আশা করি আপনাদের ফাতওয়ায়ও জায়েয হবে। সেখান থেকে উদ্ধৃতি দেখিয়ে দিলে শাগরেদরা অন্য জায়গায় আপনার বাণীগুলো প্রচার করতে হিম্মত করতে পারত।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: (বইয়ে উল্লিখিত জিহাদ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে) জিহাদ ফরয কি ফরয না তা সাবেত করার জন্য অন্য কিতাবের কী দরকার? কুরআনেইতো সব আছে। এক সূরা আনফাল নিয়ে বসলেই তো জিহাদের আয়াতের জন্য সামনে আগানো যায় না।

লেখকের জবানবন্দী: তাহলে আপনারা কি শুধু এমন সব বিষয়ই লেখেন যা কুরআন হাদীসে নেই? আমাদেরকেও তাই করতে বলছেন? আচ্ছা! মুহতারাম নিশ্চয় এটাকেও আকাবিরের তরিকাই বলবেন।

➢ **পাঠক:** মাওলানা....... সাহেব, মুহতামিম, ... মাদরাসা, না. গঞ্জ।

ভাবনা: কত বড় সাহস! বড়দের ভুলে হাত দেয়। রূমি, গাযালী, থানভী’র মত ব্যক্তিদের ভুলে হাত দেয়। বড়দের ভুলে হাত দেয়া এত সহজ বিষয় নয়। যেমন দেখো, আল্লামা সুয়ূতী রহ. বহু ভুল সত্ত্বেও সরাসরি তার ভুলগুলোতে কি কেউ হাত দিয়েছে? বরং হাশিয়া কায়েম করে তাতে শুধরে দিয়েছেন। মুহাজিরে মাক্কী রহ. তার এক পুস্তিকা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.কে সম্পাদনা করতে দিয়েছেন। তখন রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ.

একাধিক স্থানে ভুল না কেটে বরং তা চিহ্নিত করে পাশে লিখে দিয়েছেন যে, “হযরত এগুলো আমার বুঝে আসেনি”। এটাই হল ভুল ধরার আদব।

লেখকের জবানবন্দি: মনে খুব দুঃখ পেলাম।

কারণ এক. আমি কারো ভুল ধরিনি। উসূলে শরীয়তের আলোকে বুঝতে চেয়েছি এবং প্রজন্মকে কী বলব তা জানতে চেয়েছি। তালিবুল ইলমরা সেসব কথা পড়ে যে দ্বিমুখী সমস্যায় পড়বে তা থেকে বাঁচার উপায় বের করার চেষ্টা করেছি।

কারণ দুই. গাঙ্গুহী রহ. এর এ ঘটনাটি দলিল হওয়ার উপযুক্ত হল। কিন্তু গাঙ্গুহী রহ. এর যে ঘটনাটি আমি আমার বইয়ের শুরুতে উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করলাম সেটি দলিল হওয়ার উপযুক্ত হল না। এসব বে ইনসাফীর জন্যও অনেক সাহস দরকার।

কারণ তিন. আমি ইলমের উচ্চ আদালতে নিবেদন করেছিলাম যে, বড়দের লেখা হলেও যেহেতু মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তালিবুল ইলমরা দ্বিধায় পড়বে, শরয়ী উসূলের সঙ্গে মিলাতে পারবে না তাই এর প্রকাশ, প্রচার, প্রসার না হলে ভালো হত।

কিন্তু নিবেদনের বিপরীত আচরণ দেখেছি। প্রচারের সর্বোচ্চ মাধ্যমগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। তালিবুল ইলমদের যে কোন প্রশ্নের জবাবে শুধু বলা হয়েছে, বড়দের ভুল ধরা যাবে না, যে কোনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, নতুন কিছু বোঝার চেষ্টা করা যাবে না, কিতাব পড়লেই হবে না, বেয়াদবি করা যাবে না। তালিবুল ইলমরা এ নসীহতগুলোর উপর আমল করেই বড়দের এ কথাগুলো বুঝতে চেয়েছিল। কিন্তু একই জবাব দিয়ে তাদেরকে ঠাণ্ডা করে দেয়া হয়েছে।

কারণ চার. আমি কারো ভুল ধরার পথে নামিনি। বড়রা কিছু বই পড়তে বলেছেন, আর কিছু বই পড়তে নিষেধ করেছেন। আমি উভয় রকমের বইয়ের প্রতিবেদন সামনে তুলে ধরেছি। কোন প্রকার হেরফের করিনি। উদ্ধৃতিতে ভুল হয়ে থাকলে মূল বইগুলো সবার সামনে আছে।

কারণ পাঁচ. আল্লামা সুয়ূতীর ভুল ধরার নমুনা আসলে মুহতারাম দেখেননি, কারো কাছে শুনেছেন। সলফের ইস্তেদরাক, তাআক্কুবাত পড়তে হবে। মুহতারাম যে ময়দানে আছেন সে ময়দানে পড়া নিষিদ্ধ। এটা একটা সমস্যা।

কারণ ছয়. জারহ-তাদীলের কঠিন বিষয়ের কথা নাই বললাম। কিন্তু কমপক্ষে মুকাদ্দিমায়ে সহীহ মুসলিমও যদি মুহতারামের ইস্তেহযার থাকতো তাহলে আমার এ অতিরিক্ত লাইনগুলো খরচ হত না।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: কুরআন-হাদীস-মসনবী এ তিন ছাড়া কোন আলেম ছিল না। আকাবিরে দেওবন্দ অনেক ছিলেন যারা মসনবী পড়েছেন পড়িয়েছেন। বর্তমানে কিছু শুকনো ইলমের অধিকারী এখন এর উপর কালাম করতে আসে। তোমাদেরকে নষ্ট করার মত এমন হাজারো বই আছে। কত বড় সাহস ফখরুদ্দীন, গাযালী, রুমীর উপর কালাম করতে যায়।

লেখকের জবানবন্দী: প্রথম বললেন, মসনবী ছাড়া কোন আলেম ছিলেন না। পরে বললেন, অনেকে পড়েছেন পড়িয়েছেন। দুইয়ের মাঝে তাতবীকের দায়িত্ব হুজুরের উপর।

মসনবী ছাড়া আলেম ছিল না -এ তথ্য কোন শতাব্দী থেকে কোন শতাব্দীর? কোন ভূখণ্ড থেকে কোন ভূখণ্ড?

সলফের কোন কাজের উপর ইলমের আলোকে পর্যালোচনা করার পর তা 'ভেজা' হওয়াটা কতটুকু জরুরী?

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের মুসান্নিফগণের বিরুদ্ধে যখন আমরা বছরব্যাপী-জীবনব্যাপী 'কালাম' করতে থাকি তা শুকনা ইলমের ভিত্তিতে হয়ে থাকে না কি ভেজা ইলমের ভিত্তিতে হয়ে থাকে? কালামকারীরা শুকনার অধিকারী না ভেজার অধিকারী?

মসনবী أصح الكتب بعد كتاب الله এর মকামে নাকি আরো আগে? মসনবীর যে কথাগুলো আয়াত, হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হয়েছে সেগুলোর সমাধান চেয়েছি। এটা বেয়াদবি হওয়ার মানেতো হচ্ছে, আয়াতের সঙ্গে আয়াত সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে, হাদীসের সঙ্গে হাদীস সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে এবং তার সমাধানের জন্য ইলমী জীবনের অর্ধেক ব্যয়ও হতে পারে। কিন্তু মসনবীর সঙ্গে আয়াত, হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্ত সাংঘর্ষিক মনে হওয়াটাই অপরাধ?!

তথ্যগুলো তালিবুল ইলমদেরকে দেখানোর মত হিম্মত না থাকলে এ ভয়ংকর পৃথিবীতে চলবেন কীভাবে? রাস্তায় বের হবেন কীভাবে? সামাজিক জীবন কাটাবেন কীভাবে? হাজারো ইলমী প্রশ্নের সামনে একই উত্তর চালাবেন কীভাবে?

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: যুক্তির শেষ নেই। চোরেরও যুক্তি লাগে, বেদআতিরও যুক্তি লাগে। যুক্তির পেছনে পড়তে নেই। যুক্তিতে শান্তি নাই। অতএব মানার মধ্যেই শান্তি। আমরা আকাবিরের তরিকায় আছি। তাই বলছি, বই পাইলেই পড়তে নেই। যেমন মিস্টার মওদূদীর লেখা বই। থানভী রহ. তার বই দেখে বলছিলেন اس مصنف سے بد بو آرہی ہے, তাই আকাবিরের বই, থানভী রাহিমুহুল্লাহর বই, আমাদের মাদরাসার বই, ... সাহেবের বই এসব ছাড়া আর বাকি সব পড়া একদম নিষিদ্ধ।

লেখকের জবানবন্দী: যুক্তি বলে যদি দলিল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তার শেষ আছে। মুহতারাম যদি একটু দেখিয়ে দিতেন আমাদের বইয়ে উল্লিখিত দলিলগুলোর কোনটি চোরের, আর কোনটি বেদআতির। তাছাড়া চোরের ও বিদআতীর দলিল খণ্ডাতে কর্ণধারগণ এত ভয় পেলে ভক্ত মুরিদদের উপায় কী?

দলিলের পেছনে না পড়ে এবং দলিলের মাঝে শান্তি তালাশ না করে কুরআন হাদীসের অনুসারীদের উপায় কী? দলিলের বিপরীতে মানার যে দাওয়াত চলছে এর ফলাফল কী? এ পানি কোথায় গড়াবে? ভাণ্ডারী, রাজারবাগী, দেওয়ানবাগী, আটরশির অপরাধটা কোথায়? এত কিছুর পরও 'আমরা আকাবিরের তরিকায় আছি' এর পদ্ধতি কী? আকাবির দলিলের বিপরীতে মানার পথ ধরেছেন? আকাবিরের উপর এ অপবাদের কি কোন বিচার নেই?

হিম্মত করে বলে ফেললেইতো হয় যে, থানভী রহ. এর মত আমিও দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আকাবির হওয়ার পথ সহজ হয়ে যাবে। তালিবুল ইলমরাও অস্বাভাবিক রকমের ভড়কে যাবে। আকাবিরের সঙ্গে নিজের নামটা অতি সন্তর্পনে এভাবেই 'ইন' করে দেবেন যাতে কেউ বুঝতে না পারে, বিনয়ের মাঝে কোন প্রকার ব্যঘাতও না ঘটে।

- **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: তাহলে কি ওলামারা জানে না? চিৎপুটিরা কিছু দলিল দিয়ে সব সাবেত করে ফেলছে। তাহলে কি বুযুর্গরা সবাই ফাসেক?

লেখকের জবানবন্দী: ওলামারা কেরামগণ জানবেন না কেন? আর ফাসেক হতে যাবে কেন? যালেম আর ফাসেক হবে খেয়ানতকারীরা। সে আলেম হোক, পীর হোক, নেতা হোক, আমীর হোক, আমীরুল উমারা হোক যেই হোক।

সমস্যা হচ্ছে, ভুল ধরার জন্য যতটুকু পড়া দরকার ততটুকুও আমরা পড়তে রাজি নই। ফলে ভুল ধরতে গিয়েও আবার সেই ভুলের পাহাড়ই তৈরি হচ্ছে। তালিবুল ইলমদের জন্য হাসির খোরাক তৈরি হচ্ছে। সে কারণে ছেলেরা অনাকাঙ্খিত কোন আচরণ করলে সেজন্যও দায়ী এ লেখকই।
আর কোন দাবি সাব্যস্ত করার জন্য কিছু দলিল কেন লাগবে। যে কোন দাবির জন্য একটি দলিলই যথেষ্ট। বিপরীতে কোন দলিল না থাকলে একটি আয়াত বা একটি হাদীসই যথেষ্ট।

- **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: **كلمة حق أريد بها الباطل** নিজের চশমা দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায় না। **فاسأل به خبيرا** চিনতে হবে সাহাবায়ে কেরামের চশমা দিয়ে। তাঁরা এখন বেঁচে নেই। তাই আকাবিরে দেওবন্দই হলেন একমাত্র তাঁদের শাগরেদ, এঁদের চশমা দিয়ে চিনতে হয়। চশমা না থাকলে ছোটকে বড় আর বড়কে ছোট দেখতে হয়। যেমন এই চিৎপুটিরা দেখে।
লেখকের জবানবন্দী: যে কোন হক কথার ব্যাপারেই এখন এ বাক্যটির ব্যবহার চলছে। এমতাবস্থায় হক কথা বলার ব্যবস্থা কী? মনে হচ্ছে, যেই হক কথা বলছে তারই মতলব খারাপ। এরই বিপরীত ঐ ব্যক্তির মতলব কিছুটা ভালো বলে ধারণা করা যায় যে মিথ্যা কথা বলে! তাই মতলব সহীহ ওয়ালা হক কথার কিছু পদ্ধতি দরকার।
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ এর উপর আমল করতে গেলে চশমা কি নিজের চোখে থাকবে না অন্যের চোখে থাকবে? সাহাবায়ে কেরামের চশমা 'দলিল ও যুক্তি'র অন্তর্ভুক্ত না কি 'মানার মধ্যে শান্তি'র অন্তর্ভুক্ত? সাহাবায়ে কেরামের চশমা কিতাবে পাওয়া যাবে না কি স্বপ্ন, কাশফ, মোরাকাবায় পাওয়া যাবে? এ বিষয়গুলো তালিবুল ইলমদের সামনে স্পষ্ট থাকলে ভালো।
'আকাবিরে দেওবন্দ একমাত্র সাহাবায়ে কেরামের শাগরেদ' এসব কথার ব্যাখ্যা কে করবে? ব্যাখ্যা চাওয়াও বেয়াদবী। দলিলতো চাওয়াই যাবে না। কারণ, চোরের দলিল আছে। আকাবিরে দেওবন্দ কখন দলিলকে এত ঘৃণা করেছেন জানি না।

আর চশমা তত্ত্বতো আরো জটিল। চশমা না থাকলে বড়কে ছোট দেখা যায় যদি চোখ নষ্ট হয়। চিৎপুঁটি এর কী করতে পারবে। আর নিজের চশমা না পরে অন্যের চশমা পরলে সোজা রাস্তাও বাঁকা দেখা যায়। এসব জাটিল তত্ত্বজ্ঞান বোঝার মত অবস্থা কি আমাদের সাধারণ তালিবুল ইলমদের আছে। এসব সুর তো সেই ভেদ রহস্যের ইমামদের যাদের কথা কুরআন, হাদীস ও ফিকহের ইলম দিয়ে বোঝা যায় না।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: দলিলের পেছনে পড়তে নেই। এই যে জাকির নায়েক, মওদূদী। এরাও কুরআন দিয়েই দলিল দিয়ে থাকে।

লেখকের জবানবন্দী: আমার জানা মতে দলিল মানে হচ্ছে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস। এখন মুসলমান ও মুসলমানের সন্তানকে শরীয়তের দলিলের পেছনে না গিয়ে কার পেছনে যাওয়ার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। যারা এ দাওয়াত দিচ্ছে তারা কারা?! লক্ষণ খুবই খারাপ! মাদরাসার চৌদ্দ বছর ষোল বছর কি দলিলকে উপেক্ষা করার জন্য? না কি দলিলের পেছনে পড়ার জন্য? বিষয়গুলো অনেক বেশি এলোমেলো হয়ে গেল না? একটা ছোট্ট 'চিৎপুঁটির' ধাক্কায় যদি এত বড় হাঙ্গরের এ বেহাল দশা হয় তাহলে পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেবে কীভাবে?

জাকির নায়েক আর মওদূদী কুরআন হাদীস দিয়ে দলিল দিয়েছে তাই আমরা কুরআন হাদীস ছেড়ে আহবার রুহবান ধরব এ তো আরো ভয়ংকর তত্ত্ব। এতে মওদূদীরা লাভবান হবে না আমরা লাভবান হব?

আল্লাহর ওয়াস্তে একটু শান্ত হোন। নিজের স্বার্থে, তালিবুল ইলমদের স্বার্থে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে নিজেকে একটু নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ সাহায্য করবেন। সমস্যা যত বড়ই হোক দ্বীনী ও ইলমী বিষয়ে মাথা ঠাণ্ডা না রেখে উপায় নেই।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: আল্লাহ তাআলা আদম আলইহিস সালামকে জান্নাত থেকে নেমে যেতে আদেশ করেছেন। يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا তিনি নেমে গিয়েছিলেন। কোন যুক্তি পেশ করেননি। অথচ তাঁর যুক্তি ছিল। ইসলাম মিটিয়ে দেয়াকে বলে, যুক্তি পেশ করে নয়। সুতরাং ভালো করে শোন, কওমী মাদরাসাও এটারই নাম। কোন যুক্তি নেই এবং কোন রায় নেই।

লেখকের জবানবন্দী: কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারিনি। আমাকে ধোলাই করা হচ্ছে এতটুকু বুঝেছি। ছোট্ট দু'টি নিবেদন। একটি হচ্ছে, 'কওমী মাদরাসা এটারই নাম' বলে যেভাবে حصر করা হচ্ছে, এর দ্বারা বক্তা ও শ্রোতার পেরেশানী বাড়বে। পেরেশানীটা এখন বুঝে আসবে না। চুলাকানী বন্ধ হলে পরে বুঝে আসবে। কারণ যুক্তি ও দলিল যখন ডাস্টবিনে তখন এ রকম حصر এর সাথেই কওমী মাদরাসার আরো কত সংজ্ঞা যে দিতে হবে তা বক্তাও গুনে শেষ করতে পারবেন না, শ্রোতাও গুনে শেষ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় নিবেদন হচ্ছে, 'যুক্তি নেই রায় নেই' এটা কি উম্মতের কারো জন্য নেই না কি কারো জন্য আছে, আর কারো জন্য নেই। যিনি দলিল জবাই করে মানার নসীহত করে চলেছেন তিনি কোন অবস্থানে আছেন? যা বলে চলেছেন তা যুক্তি, দলিল ও রায়ের ভিত্তিতে চলছে না কি মানার ভিত্তিতে?

দলিলকে মানলে তা মানার অন্তর্ভুক্ত হবে না, আহবার রুহবানকে মানলে তা মানা হবে এ পার্থক্যগুলোও তালিবুল ইলমদেরকে বুঝিয়ে দিলে ভালো হবে।

আকাবিরে দেওবন্দতো নিজেদেরকে আহবার রুহবানের মকামে মনে করতেন না। নিজদের অনুসারীদেরকে এভাবে অনুসরণ করার দাওয়াত দেননি। দলিল জবাই করে শুধু অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেননি। তাহলে আমরা এখন এসব কথা বলে কোন আকাবিরে দেওবন্দের মাসলাক মাশরাবের দিকে ছেলেদেরকে ডাকছি?

ছেলারাতো নিরুপায় হওয়ার আরেক ধাপ পার করল। আকাবিরে দেওবন্দের মাসলাক মাশরাব জানার জন্যওতো কোন বই পড়া যাবে না। সে বিষয়েও স্থানীয় আহবার রুহবানের কথাই বিশ্বাস করতে হবে। কিতাব পড়লেই দলিল ও যুক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এবং জাকির নায়েক বা মওদূদী হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেবে।

- পাঠক: সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: জালেম বলেছে, হাফেজ্জী হুযুর নাকি দেওবন্দের শত্রু!!! তোমরা জবাব দিয়ে দেবে, ইবলিসেরও যুক্তি ছিল। আদা বেপারী জাহাজের খবর নিতে আসছে। এ ইবলিসের মত।। তার মধ্যে অহংকার আছে যেমন ইবলিসও অহংকার করেছিল إنه لا يحب المستكبرين।

লেখকের জবানবন্দী: ইশকের ময়দানে জালিম শব্দটি ভালবাসার শব্দ। এ ময়দানের মানুষ এত দামী শব্দটি হঠাৎ আমার জন্য কেন ব্যবহার করলেন? একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।

আগেই বলেছিলাম, বই না পড়ে ভুল ধরলে ভুলের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। দুষ্টু মুরীদরা ভিত্তিহীন কথা মুখে পুরে দিয়ে পালাবে। এরপর আরেক মুরীদ এসে বলবে, হুজুর! হাফেজ্জী হুজুরকে কোন জায়গায় দেওবন্দের শত্রু বলা হয়েছে একটু পৃষ্ঠা নম্বরটা দিলে ভালো হত। হুজুর তখন পেছনে তাকিয়ে দেখবেন আগের মুরীদ পালিয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য অবশ্যই লেখক দায়ী থাকবে না।

আর ছেলেরা জাবাব দিতে পারবে, কারণ তাদের বই পড়া আছে। কিন্তু ছেলেদের বাবাদের কী উপায় হবে?

যুক্তি, দলিল ইত্যাদি কখন থেকে যে সব ইবলিসের দখলে চলে গেল?! জাকির নায়েক, মওদূদী, বিদআতী সবাই মিলে দলিলগুলো দখল করে এখন আমাদেরকে দলিল বিহীন জীবন যাপনে বাধ্য করল -এ আজব কারগুজারী। আমাদের এখন উপায় কী? ইবলিসের বিরোধিতা করার জন্য এখন আমাদেরকে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস সব ছাড়তে হবে?

মুহতারাম, চুঙ্গার এত ভিতরে ঢুকতে গেলেন কেন? বের হওয়ার কি কোন আশা ভরসা নেই? আদা বেপারীর আদার প্রয়োজন হলে সে আদা আমদানীর জাহাজের খবর নিলে খুব অপরাধ হয়ে যাবে? আমরা আদার অভাবে সবাই মরে গেলাম। জাহাজের খবর না নিয়ে আমাদেরকে কী করতে বলেন। পানি খেয়ে আদার প্রয়োজন মিটাবো?

যে ময়দানের গরমে আমরা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছি সে ময়দানের সবকাটাও ইয়াদ রাখা গেল না। এ ময়দানে নিজেকে চুনোপুঁটি ভাবতে শেখানো হয় না কি অন্যকে? না কি এ সবক এখন বদলে গেছে?

- **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: (যার কাছে বইটি পাওয়া গেছে তাকে অফিসে ডেকে এনে খুব মারধর ও বেত্রাঘাত করে অভিভাবক ডেকে এনে বের করে দেয়ার হুমকী দেয়া হয়েছে। পরে এর জন্য তাকে হুজুরের পা ধরে মাফ চাইতে বলা হয়। সে মাফ চাইতে অস্বীকৃতি যানায়। এ প্রেক্ষিত্রে হুজুরের বক্তব্য) জানিস এ বইয়ে কি আছে? এ বইয়ে কুফরী কথাবার্তা আছে।

লেখকের জবানবন্দীঃ সে কুফরী কথাগুলোর উদ্ধৃতিও আছে। সে কুফরী থেকে বাঁচার আবেদনও আছে। তালিবুল ইলমদেরকে বাঁচানোর আবেদনও আছে। অপরাধের অংশটা কোনটা?

➢ **পাঠকঃ** মাওলানা ...... সাহেব। তালিবুল ইলম ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ। জামেয়া .... না. গঞ্জ।
ভাবনাঃ উনার প্রথম বই ঠিক ছিল, কিন্তু পরেরটা ঠিক নয়। কারণ উনি নিজেই নিজের উসূল অনুযায়ী কাজ করেননি। তিনি প্রথম বইয়ে একটি কথা বলেছিলেন, 'সমালোচনাকে আত্মসমালোচনার গণ্ডিতে আটকাতে হবে'। এই অনুযায়ী তার প্রথম বইটি সঠিক। কিন্তু পরের বইয়ে তিনি নিজেই আত্মসমালোচনার গণ্ডি পেরিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।
লেখকের জবানবন্দীঃ ইনশাআল্লাহ তৃতীয় বই আসলে দ্বিতীয়টিকে ঠিক মনে হবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

➢ **পাঠকঃ** সাবেক মুহতারাম।
ভাবনাঃ তার ভাষা দেখ 'আল্লামা রূমীর কথাই কি শেষ? মানসূর হাল্লাজের কথাই কি শেষ?' এটা আলেমের ভাষা হতে পারে না। অপর দিকে মুফতী তকী উসমানীর ভাষা দেখ 'আপন প্রদীপ জ্বালি' কত তফাত।
লেখকের জবানবন্দীঃ আমাকে এতটা বড় বানানো ঠিক হয়নি। আমি ও মুফতী তকী ওসমানী সাহেব হুজুরের মাঝে যত হাজার মাইলের ব্যবধান সে হিসাবে ভাষার ব্যবধান হওয়ার কথা ছিল আরো অনেক বেশি।
এটাতো ভাষার সমস্যা গেল। মূল সমস্যার সমাধান কী?

➢ **পাঠক.** মুফতী ..... সাহেব। আমার মুহসিনদের অন্যতম। সর্বশেষ সাক্ষাতেও আমাকে মুহাব্বত করেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। যে কারণে নারাজ হয়েছেন, নারাজির কোন কারণ এখনো জানতে পারিনি।
ভাবনাঃ গোমরাহ হয়ে গেছে। (কামনা করি এর সনদ জাল হোক)
লেখকের জবানবন্দীঃ আমাদের মুরুব্বীদের সামনে আমাদের গোমরাহী ধরা পড়া মানে আমাদের শুদ্ধ হওয়ার পথ খোলা থাকা। এখন শুধু প্রয়োজন গোমরাহীগুলো চিহ্নিত হওয়া এবং শুদ্ধ হওয়ার পাথে আমাদেরকে সহযোগিতা করা। আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করবেন। শুধু গোমরাহ ফাতওয়া দিয়ে ঠেলে ফেলে দিতে চাইলে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আমীন।

➢ **পাঠক.** মুফতী ..... সাহেব, প্রধান মুফতী, জামেয়া ..... না. গঞ্জ।
ভাবনা: এত বড় ভয়ংকর ফিতনা কওমী মাদরাসার ইতিহাসে আর কখনো আসেনি।
লেখকের জবানবন্দী: ফিতনায় পতিত ব্যক্তির নিকট সুন্নতকে ভয়ংকর ফিতনা মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। আর মুফতী সাহেব কি কষ্ট করে ফিতনার অংশটুকু চিহ্নিত করে দেবেন!

➢ **পাঠক.** সাবেক মুহতারাম।
ভাবনা: বইটির আলোচনা করতে গিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে- তোমরা কি আকাবিরদের থেকে 'নস' বেশী বুঝে ফেলেছো! তোরা 'নস' বেশী বুঝেছিস, তোদের পরিণতি খুব খারাপ। 'নস' পড়ে তোরা এখন পেখম খুলেছিস।
লেখকের জবানবন্দী: আবারও সেই আদি ও আসল উক্তি। নিজের অজ্ঞতাকে আকাবিরের উপর চাপিয়ে দেয়া। আকাবিরের বুঝের বাইরে একটি 'নস'ও বইয়ে উল্লেখ হয়নি। আর 'নস' বুঝলে পরিণতি খারাপ হবে কেন! আমাদের আকাবিরগণ তো 'নস' না বুঝলে পরিণতি খারাপ হওয়ার কথা বলেছেন। এবং আকাবিরগণ 'নস' পড়ার পরেই পেখম খুলেছেন, পড়ার পূর্বে খোলার তো কোন ব্যবস্থা নেই।

➢ **পাঠক.** সাবেক মুহতারাম।
ভাবনা: এইসব বই যারা লিখে, তাদের আকলে কুকুর পেশাব করেছে।
লেখকের জবানবন্দী: মুফতী সাহেব অবশ্যই কোন ভদ্র পরিবারের সন্তান!!!!!!!!!!!!!!!

➢ **পাঠক.** সাবেক মুহতারাম।
ভাবনা: (লেখক সম্পর্কে বলেন) এরা এমন ব্যক্তি যাদের ব্যাপারে কোন স্বীকৃতি নেই। না তাদের কোন 'ইলমী কারনামা' রয়েছে, না আমলী ময়দানে কোন 'দখল' রয়েছে।
লেখকের জবানবন্দী: 'ইলমী কারনামা' তৈরি হওয়ার পদ্ধতি কী? 'ইলমী কারনামার' প্রথমটির উপরও তো একই আপত্তি আসবে। মানতেকী পরিভাষায় 'দাওর' বা 'তাসালসুল' লাযেম আসছে না?

➢ **পাঠক: মুহাদ্দিস, মুফতী, লেখক .... সাহেব। নোয়াখালী। আমাকে মুহাব্বত করেন এ দাবিতে কখনো ত্রুটি দেখিনি।**

ভাবনা: এ কাজগুলো করে তাঁর যে 'অকার' ছিল তা কমে গেছে।

লেখকের জবানবন্দী: মুহতারাম আমার যে 'অকার' এর কথা বলেছেন তা কখনো ছিল কি না তা আমার জানা নেই। তাঁর দাবি অনুযায়ী যদি তা থেকে থাকে তাহলে সে 'অকার' কোন কাজে লাগানোর জন্য আমি জমা করে রাখব? যে কাজে এখন তা খরচ হল এর চাইতে আরো জরুরী এমন কী কাজ আছে যার জন্য আমি আমার এ 'অকারগুলো' সংরক্ষিত রাখব?

আমি যদি উদাহরণ হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চল্লিশ বছরের অর্জিত 'অকার'র কথা উল্লেখ করি তাহলে তা কি খুব বেখাপ্পা হবে? চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরে অর্জিত 'আলআমীন' খেতাব দুই তিন মিনিটের বক্তব্যে تبا لك يا محمد এর গালিতে পরিণত হয়েছিল।

আমাদের অর্জিত ও কাল্পনিক 'অকার' সংরক্ষণ কতটুকু জরুরী, আর সত্যকথন কতটুকু জরুরী। যেভাবে আমরা চলছি সেভাবে অকারগুলো কি আসলে এখনো আছে? অকার নষ্ট হওয়ার ভয়ের কথাতো বহু কাল থেকে শুনে আসছি। এ মেয়াদ এবার শেষ হওয়া দরকার।

আপনি অকারের কথা বলছেন। এতো অনেক উপরের শব্দ। আমার এখন লুঙ্গি নিয়ে টানাটানি চলছে। কিন্তু কিছু করার নেই। আমার প্রতি আপনাদের নেক দৃষ্টি ও মুহাব্বত-ভালোবাসার উত্তম বদলা আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দান করুন। আমীন।

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা

আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব

সিরিজ-১

দারুল উলূম দেওবন্দ পূর্বসূরি উত্তরসূরি

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله

'দারুল উলূম দেওবন্দ : পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি' বইটির বয়স একেবারেই সামান্য। সর্বোচ্চ দুই মাস হবে। কিন্তু এরই মধ্যে পাঠক মহলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেছে। একজন লেখককে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য আরেকটু সময় দেয়ার দরকার ছিল। এতে লেখকের জন্য একটু সুবিধাজনক হলেও পাঠকের এমন কোন বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেত না। বিশেষত একজন নবীন ভাবুক বা বলা যায় একজন অপরিপক্ক কাঁচা পেরেশান হাল তালিবুল ইলমের একটি ভাবনাকে এতটা কঠিনভাবে আঘাত না করে লেখকের মনের অবস্থা এবং চলমান পৃথিবীর অবস্থাকে তুলনা করে আমাদের কি করা

উচিৎ সে দিকটা নিয়ে ভাবার পেছনে মেধা বেশি ব্যয় করলে আমার মনে হয় উম্মতের বেশি ফায়দা হত।

এ বইয়ে বিবৃত সমস্যাগুলো যদি বাস্তবিক সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে এর উপর যে মন্তব্যগুলো করা হচ্ছে এবং যেভাবে করা হচ্ছে এভাবে কি এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব? এই বইয়ের লেখক হওয়ার অপরাধে আসামী হিসাবে বইয়ের উপর কৃত আপত্তিগলোর উপর সংক্ষিপ্ত জবানবন্দি আমি দিয়ে যাব। কিন্তু আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচার করাতো আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই পাঠকের মন্তব্য পাঠকের আদালতেই আমি তুলে ধরলাম। **কারণ, সর্বাবস্থায় পাঠক পাঠকের আপন। আর লেখকের মত অপরাধী এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই**। যদি শুধু লেখাটাই একটা জঘন্য অপরাধ না হয়ে থাকে তাহলে একটি লেখা কেন তৈরি হয়েছে? প্রেক্ষাপটটা কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে? লেখাটার উপকারিতা কতটুকু? শতকরা কত ভাগ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, একটি গর্হিত কাজ, চিন্তা, পদ্ধতি থেকে বাঁচার জন্য যে ফরয দায়িত্ব রয়েছে তা আমরা অতিক্রম করে চলছি কি না? -এ সকল বিবেচনাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রুচিবহির্ভূত হওয়ার কারণে, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিপরীত হওয়ার কারণে একটি লেখাকে কেন এতভাবে আঘাত করা হবে?! একজন সমালোচকও এ দাবি করছেন না যে, এ বইয়ের এ কথাটি বাস্তবভিত্তিক নয়, বা এ কথাটি শরীয়তের উসূলের আলোকে ভুল। কিন্তু আঘাতমূলক শব্দের ব্যবহারে কারো কোন কমতি নেই। ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা।

বইয়ের প্রশংসা যে করা হয়নি এমন নয়। শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ পাঠকের পক্ষ থেকেই ভালো ভালো মন্তব্য এবং উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য পেয়েছি। কিন্তু সেসব প্রশংসার কিছু আছে আমার প্রতি স্নেহের আতিশয্যে, কিছু আছে এমন যা 'ইতরাউল মাদিহ' বা স্তাবকের মাত্রাতিরিক্ত স্তুতি, আর কিছু আছে এমন যা শুধুমাত্র আমাকে উৎসাহিত করার জন্য বলা হয়েছে। আর কিছু বাস্তবিক প্রশংসা থাকতেও পারে যা উপযুক্ত পাত্র থেকে প্রকাশ পেয়েছে কি না তা নিয়ে পাঠকের যথেষ্ট সন্দেহ থাকতে পারে এবং এ সন্দেহের যথেষ্ট পরিমাণ কারণও রয়েছে।

যাই হোক প্রশংসার কথাগুলো শুনে পাঠকের কোন লাভ নেই। আমাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য বলা হয়ে থাকলে উদ্দেশ্য আদায় হয়ে গেছে। আমি প্রয়োজন পরিমাণ উৎসাহ বোধ করছি। অতএব এখানে পাঠকের সমালোচনাগুলোকেই তুলে ধরছি। পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা

তুলে ধরতে গিয়েও আমার যথেষ্ট পরিমাণ ভুল হবে। এটা আমি জানি। তবু আমার মনে হয় বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সবাই একসাথেই ভাবি। কারণ সমস্যা সবার। আমার একার নয়। তাই আমি একা তা হজম করতে চাই না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ভালো কিছুর ফায়সালা করুন। আমীন।

➢ **পাঠক:** প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত উচ্চমাধ্যমিকের একজন তালিবুল ইলম।
ভাবনা: মনে হয় শুধু ওনারাই বোঝেন, আর কেউ বোঝে না।
লেখকের জবানবন্দি: 'কেউ বোঝেনি' এমন কোন কথা বা এমন কোন ইঙ্গিত এ বইয়ে নেই।

➢ **পাঠক:** উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত ও শিক্ষাবিদ। এক সময় আমাকে ভালোবাসতেন, এখন কী অবস্থা জানি না।
ভাবনা: আসল যে কথাটি লিখতে চেয়েছেন তা শেষ করলেন না কেন?
লেখকের জবানবন্দি: এটা একেবারেই একটি সন্দেহসাত্র।

➢ **পাঠক:** সেরা আলেমগণের একজন
ভাবনা: মারাত্মক! এসব কথা লিখার কী প্রয়োজন?
লেখকের জবানবন্দি: প্রয়োজনটা 'একান্ত আলাপন' এবং এসব কথার আগে পরে বলা হয়েছে।

➢ **পাঠক:** তরুণ আলেম। এক সময় আমাকে খুব ভালোবাসতেন, এখন আর ভালোবাসবেন কি না এ বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।
ভাবনা: কারো বাবা মদ খেলে কি তিনি তা লিফলেট লিখে প্রচার করবেন?
লেখকের জবানবন্দি: বাবার সমস্যা নিয়ে লেখা লিফলেট বাবার কাছেই পাঠানো হয়েছে। আর পাঠানো হয়েছে বাবা মদ খাওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পর। এর আগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অন্যসব পন্থা অকৃতকার্য হয়েছে।

➢ **পাঠক:** বড়দের অনুসরণের দাবিতে পদকপ্রাপ্ত তরুণ আলেম।
ভাবনা: এ লেখায় মনের ব্যথা আছে ঠিক, তবে ক্ষোভও রয়েছে অনেক।
লেখকের জবানবন্দি: কার বিরুদ্ধে?! কার উপর?! কিসের জন্য? দ্বীনের জন্য না কি পার্থিব স্বার্থের জন্য?

➢ **পাঠক:** সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার, মুফতী, মুহাদ্দিস।

ভাবনা: দরসের মধ্যে কতো কথাই এসে যায়, আমরা কি জিহাদ অস্বীকার করি না কি?!
লেখকের জবানবন্দি: হাদীস-তাফসীরের দরসে অস্বীকার করার পর স্বীকার করার ক্ষেত্র আর কোথায় পাওয়া যাচ্ছে?

- **পাঠক:** সিনিয়র মাদরাসার যিম্মাদার। এক সময় আমাকে খুব পছন্দ করতেন। এখন একদম পছন্দ করেন না

ভাবনা: বড় হলে মানুষ গোঁয়াড় হয়ে যায়।
লেখকের জবানবন্দি: কথাগুলো আর কীভাবে বললে এ বদনাম থেকে বাঁচা যাবে?! চলমান পৃথিবীতে গোঁয়াড়ের সংজ্ঞা হচ্ছে, ইসলামের যে কোন বিধানকে শক্ত করে ধরে রাখা। পরিস্থিতির হাতে শরীয়তের বিধানকে ন্যস্ত করে দিলেই এ বদনাম থেকে বাঁচা যাবে।

- **পাঠক:** উচ্চ মাধ্যমিকের তালিবুল ইলম। প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

ভাবনা: (যে উস্তাযের মাধ্যমে সে বইটি পেয়েছে তাঁর ব্যাপারে) বেয়াদব।
লেখকের জবানবন্দি: বেয়াদবের সংজ্ঞা তালাশ করছি। মিলাতে পারছি না।

- **পাঠক:** দরজা উলয়া-স্নাতকের তালিবুল ইলম।

ভাবনা: (ধমকের সুরে) এসব তথ্য লেখককে কে সরবরাহ করেছে?!
লেখকের জবানবন্দি: সরবরাহকারীর বিচার হলে কি মূল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে

- **পাঠক:** রাজধানীর শীর্ষ পর্যায়ের মাদরাসার যিম্মাদার।

ভাবনা: যেসব বইয়ে আমাদের আকাবিরের তাকরীয নেই সেসব বইয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই, সেসব বই পড়বে না।
লেখকের জবানবন্দি: আকাবিরের একটি সংজ্ঞা ও বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করলে লেখদের জন্য সুবিধা হতো। আর দলিলের পেছনে, তথ্যের পেছনে সময় ব্যয় না করে তাকরীয সংগ্রহের পেছনে সময় ব্যয় করা একজন লেখকের জন্য অবশ্যই অনেক সহজ। আমার বয়সের অর্ধেক বয়সের তরুণরা বিভিন্ন বইয়ের তাকরীয লিখে দিয়ে আকাবির হচ্ছে। আমরা কি তাদের পেছনে একটু সময় ব্যয় করবো? আকাবিরের তাকরীযগুলো বর্তমানে কীভাবে সংগ্রহ করা হয় তা কি মন্তব্যকারীরা জানেন না?

- **পাঠক:** সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার।

ভাবনা: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع

লেখকের জবানবন্দি: আমি বইয়ে বলেছি, ঘটনাগুলোর নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি আমার কাছে আছে। মন্তব্যকারী নিজেও জানেন তিনি এবং তাঁর মত লোকেরা এ ঘটনাগুলো অহরহ ঘটিয়ে চলেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রশ্নের সম্মুখিন হবেন বলেই উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা হয়নি। এটাই যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং যাতায়াত ব্যবস্থাসহ লিখে দেব।

➢ **পাঠক:** পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বড় হুজুর। যিনি আমাকে ভালোবাসতেন, এখনো আশা করি ভালোবাসেন।
ভাবনা: সবাই খালি মুসলিহ হয়ে যায়!
লেখকের জবানবন্দি: এই বইয়ে ইসলাহের পথ খুঁজতে বড়দের কাছে আবদার করা হয়েছে মাত্র।

➢ **পাঠক:** সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার।
ভাবনা: এটা কি ইসলাহের কোন পদ্ধতি হল?!
লেখকের জবানবন্দি: কোন পদ্ধতিই পাইনি। এটাও কোন পদ্ধতি নয়। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র পরিস্থিতির উপলব্ধি। তবে এতটুকু বলা যায় যে, থানভী রহ. এর 'ইসলাহুর রুসূম' 'আলইলমু ওয়ালউলামা' একটা লেখাই। 'প্রচলিত জাল হাদীস' 'প্রচলিত ভুল' লিখিত কর্মই।
সহজ একটি প্রশ্ন এখানে আসতে পারে, আপনি কি আশরাফ আলি থানভী হয়ে গেছেন? নিজেকে আশরাফ আলি থানভী মনে করছেন?
এক্ষেত্রে আমার নিবেদন হচ্ছে, আশরাফ আলি থানভী রহ. নিজেকে মুজাদ্দিদে আলফেসানী মনে করে কাজগুলো করেননি। নিজেকে আশরাফ আলি মনে করেই করেছেন। আমিও নিজেকে যুবায়ের মনে করেই করেছি। জরুরী কাজ করার ক্ষেত্রে নিজেকে আরেক জন মনে করতে হবে কেন? আর নববী আদর্শের অনুকরণে কাজ করার অর্থ কি নিজেকে নবী মনে করা?
আমরা কি আসলে সমস্যাগুলোকে সমস্যা মনে করছি না? না কি এর সমাধানের কোন ইচ্ছা আমাদের নেই?

➢ **পাঠক:** আমার ধারণামতে একজন রুচিশীল সচেতন আলেম। আমাকে ভালোবাসেন বলেই আমি ধারণা করি। বাকি আল্লাহ ভালো জানেন।
ভাবনা: ইখলাসের সাথে লিখে থাকলে ঠিক আছে।
লেখকের জবানবন্দি: লেখকের ইখলাসে ত্রুটি থাকলেও বাস্তব সমস্যার সামাধান খুঁজে বের করতেই হবে। বাকি ইখলাসের দুর্বলতা থেকে আল্লাহ সবাইকে হিফাযত করুন।

➢ **পাঠক:** পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক।
ভাবনা: বলতে সবাই পারে। পারলে উনি একটা করে দেখাক!
লেখকের জবানবন্দি: অনেকেতো বলেন, এ কথাগুলো মিথ্যা। তাহলে সবাই বলতে পারে কীভাবে বুঝি? আর অভিযোগকারী সম্ভবত চাঁদাবিহীন মাদরাস করার কথা বলছেন। কিন্তু আমাকে দিয়ে কেন নতুন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে? দেশে কি এর বাস্তব উদাহরণের অভাব আছে? আর উদাহরণ দিলে যদি অজুহাত বের হয় 'উনি ৪ ফুট ৭ ইঞ্চি। উনার সঙ্গে আমাদের উদাহরণ চলে না' তখনতো লেখক আবারো অসহায়।

➢ **পাঠক:** পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক।
ভাবনা: উনি মুহতামিম নয়তো এ কারণে। যদি মুহতামিম হতেন তাহলে বুঝতেন।
লেখকের জবানবন্দি: সেই আদি ও আসল উক্তি। যার অর্থ হচ্ছে, বাদশাহের ভুল ধরতে হলে নিজে বাদশাহ হতে হবে এবং মেথরের ভুল ধরতে হলে নিজে মেথর হতে হবে এবং লেখকের ভুল ধরতে হলে লেখক হতে হবে।

➢ **পাঠক:** ইলম ও আমলে অনুসরণীয় দেশের শীর্ষ কয়েক জনের একজন। শারাফত ও ভদ্রতায় আমার দেখা অদ্বিতীয়। আমাকে অনেক স্নেহ করেন। আশা করি এখনো করেন, সামনেও করবেন।
ভাবনা: কোন মুরুব্বী নেইতো! এই কারণে।
লেখকের জবানবন্দি: আমার মুরুব্বী আছে। মুরুব্বীদের নাম ভাঙ্গিয়ে অতীতে বহু পুল পার হয়েছি। যেখানে বাবার নামের মূল্য বেশি ছিল সেখানে বাবার নাম বিক্রয় করেছি। যেখানে নানার নামের মূল্য বেশি ছিল সেখানে নানার নাম বিক্রয় করেছি। আর যে অঙ্গনে মারকাযুদ দাওয়ার মূল্য বেশি সেখানে মারকাযের নাম বিক্রয় করে খেয়েছি। কিন্তু যে কাজে সবার

নাক এক সঙ্গে কাটা যাবে সে কাজের বদনাম মুরুব্বীদের উপর চাপাতে চাইনি। তবে মুরুব্বী ছাড়া করিনি। পরামার্শ ছাড়াও করিনি। খুব তড়িঘড়িও করিনি। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিন্তা না করেও করিনি।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম

ভাবনা: এর দ্বারা একজনের দোষ সবার উপর চাপানো হয়েছে।

লেখকের জবানবন্দি: শত্রু যেন স্খলিত ব্যক্তি ও ব্যক্তির স্খলিত অংশ দিয়ে সবার বদনাম করতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই এ বই লিখা হয়েছে, তাই সে কথাটিই বার বার উচ্চারণ করা হয়েছে।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: জীবনের সব ক্ষোভ এক সঙ্গে ঝেড়ে ফেলেছেন।

লেখকের জবানবন্দি: কার উপর এ ক্ষোভ? এর কোন বিষয়টি লেখকের ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে জড়িত? একান্ত যদি ক্ষোভ হয়ও তবু এ লেখক কি البغض في الله এর একটি সাওয়াব পাওয়ার অধিকার রাখে না?

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

ভাবনা: যে কাজটি নাস্তিকরা করতো সে কাজটা তিনি করে দিয়েছেন।

লেখকের জবানবন্দি: নাস্তিকরা কয়েক দশক আগে থেকেই অডিও, ভিডিও, সিনেমা, নাটক, লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে এ বিষয়গুলো সাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং ভয়ংকরভাবে দিয়ে চলেছে, যার খবরও আমরা পাইনি। যারফলে সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যে বিপজ্জনক হারে বিগড়ে গেছে এবং বিগড়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের শুধরানোর সুযোগ হয়নি। তাই আমাদের শুধরানোর পথ খুঁজে চলেছি। কিন্তু বড়দের মন্তব্যের আলোকে মনে হচ্ছে, এ পথও কঠিন। আখের কী হবে? আমরা কী করব?!

➢ **পাঠক:** উচ্চতর শিক্ষা-তাখাসসুস বিভাগের মুশরিফ।

ভাবনা: পরবর্তীদের উপর দোষ চাপিয়ে আকাবিরে দেওবন্দকে যতটা ত্রুটিমুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তারা কি বাস্তবেই এতটা ত্রুটিমুক্ত? মনে হয় এ ক্ষেত্রে বেশি পক্ষপাতিত্ব হয়ে গেছে।

লেখকের জবানবন্দি: বাস্তবে এতটাই ত্রুটিমুক্ত। শুধুমাত্র মানবিক দুর্বলতার কারণে যতটুকু স্বাভাবিক ততটুকুই তাঁদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে। আর যতটুকু ত্রুটি প্রকাশ পেতেই পারে ততটুকু আমরা স্বীকার করেছি। অন্যায় পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই আসতে পারে না।

- **পাঠক:** দাওয়াতী কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, মুতালাআ'র প্রতি আগ্রহ আছে। আমার প্রতি ভালো ধারণা রাখতেন। এখন কী অবস্থা জানি না।

ভাবনা: বইয়ের উপস্থাপনায় মনে হয় দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দ হচ্ছে হকের মাপকাঠি এবং একমাত্র মাপকাঠি। উসূলে শরীয়তের আলোকে এ মানসিকতা কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

লেখকের জবানবন্দি: আকাবিরে দেওবন্দকে একটি فئة مجددة সংস্কারক কাফেলা হিসাবে এবং ভারত উপমহাদেশের জন্য সবচাইতে বড় সংস্কারক কাফেলা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। লেখকের বিশ্বাস এখনো এটাই এবং এ বিষয়ে লেখকের কোন দ্বিধা নেই।

- **পাঠক:** একজন জুনিয়র ইসলামী চিন্তাবিদ

ভাবনা: তিনি দ্বীনের প্রত্যেক বিভাগের কাজের ভুল ধরেছেন, তাহলে আমরা কি শুধু উনাকেই আকাবির হিসাবে মেনে চলব?

লেখকের জবানবন্দি: এ মুহতারাম সম্ভবত রাগের মাথায় বইটি পড়েছেন। এই বইয়ে বলা হয়েছে, দ্বীনের প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের দুর্বলতার কারণে যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে তার কারণে দ্বীনী কাজের ঐ বিভাগটি দায়ী হবে না, দায়ী হবে ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তির বিশেষ চিন্তা-চেতনা।

আর আকাবির হওয়ার কোর্সে এ লেখক এখনো ভর্তি হয়নি। তাই পাঠক ভুল করলে সে জন্য লেখক দায়ী থাকবে না।

- **পাঠক:** তরুণ, যোগ্য গবেষক ও শিক্ষাবিদ।

ভাবনা: এটা হুজুরের তাফাররুদ।

লেখকের জবানবন্দি: এ বইয়ের কোন বিষয়টি, কোন দাবিটি, কোন তথ্যটি এবং কোন মাসআলাটি এমন যা এ লেখকের কলম দিয়ে সর্বপ্রথম বের হয়েছে এবং এর কোন গ্রহণযোগ্য উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে না। আর যদি 'তাফররুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, স্বীকৃত এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে 'তাফাররুদ', অর্থাৎ এ বিষয়ে আর কেউ কথা বলেনি, তাহলে পরিভাষাটির ব্যবহার এ ক্ষেত্রে কেমন?

➢ **পাঠক:** আমার উস্তাযে মুহতারাম। অনেক মুহাব্বত করেন। এখন মনে হচ্ছে মনে খুব ব্যথা পেয়েছে।
ভাবনা: ইলিয়াস মানতেকীর মতো হয়ে গেছে। যে টুপি মাথায় দেয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল।
লেখকের জবানবন্দি: আশা করি এমন হয়নি এবং হবেও না। আল্লাহ হিফাযত করুন। সবার কাছে দোয়া চাই। বদদোয়া দিয়ে নিজেদের ছেলের ক্ষতি করলে শত্রুই খুশি হবে।

➢ **পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।
ভাবনা: আহ হা! আফসোস। একটা প্রতিভা লাইনচ্যুত হয়ে গেল!
লেখকের জবানবন্দি: আলহামদু লিল্লাহ প্রহরী আছে। উসূলে শরীয়াহ, উসূলুদ দাওয়াহ, উসূলুল হাদীস, উসূলুল ইসলাহ কোনটির আলোকে কোন ভুল এখনো কেউ উপস্থাপন করেনি। তাই এখনই নিরাশ না হয়ে ভালো কিছু আশা করলেই ভালো হবে। শুনেছি, বাবা মনে কষ্ট পেলেও ছেলেকে বদদোয়া দেয় না। বাবার মনোকষ্টের চাইতে ছেলের আবদারটাই নাকি বড়। তাই আমিও সে আবদার করতে পারি।

আর আকাবিরের পথ ত্যাগ করার কোন চিন্তা আলহামদু লিল্লাহ এখনো মাথায় আসেনি। কিন্তু এ অশুভ কথাটি বার বার উচ্চারণ করার কারণে যদি আমাদের কোন পক্ষের কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর দরবারে আমি সঠিক বিচার পাব। এ বিষয়ে আমার আত্মবিশ্বাস আছে।

➢ **পাঠক:** এক বিদেশী সাহায্যনির্ভর মাদরাসার যিম্মাদার।
ভাবনা:...... (এক হক্কানী বুজর্গ) এর (গোমরাহ) ছেলে ......র মতো হয়ে গেল।
লেখকের জবানবন্দি: নাহ! এখনই এ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি। গোমরাহীর উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন না করে, অবস্থার সঠিক উপলব্ধি মাথায় না এনে, সমস্যা সমাধানের কোন কর্মকাণ্ড হাতে না নিয়ে, এত কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আরেকটু ভাবার দরকার ছিল। আল্লাহ সবাইকে মাফ করুন। বেরেলভী ও গায়রে মুকাল্লিদদের মত শুধুমাত্র নিজের মতের বিপরীত হলেই গোমরাহ ফাতওয়া দিলে বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধানের কোন আশা করা যায় না।

➢ **পাঠক:** প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির জেলা যিম্মাদার। যার কাছে আমি এখন কাবাবের হাড্ডি হয়ে আছি। ফেলতে গেলে গোশতসহ লোকমা ফেলে দিতে হয়।

ভাবনা: যুবায়ের সাহেব একটা বই লিখেছেন, সে বইটা যেই পড়বে সেই মনে করবে, বইটা তার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে।

লেখকের জবানবন্দি: হ্যাঁ! খোদ লেখকেরও একই অবস্থা! খোদ লেখকও বইটা পড়লে লেখকের মনে হয় কথাগুলো লেখকের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। আসলে সমস্যাগুলো এতটাই ব্যাপক হয়ে গেছে যা থেকে আমরা কেউই বেঁচে থাকতে পারছি না। কিন্তু বাস্তব সমস্যাকে অস্বীকার করে, প্রতিকারের চিন্তা না করে বোঝা আর বাড়াতে চাই না। আমরা আসলে সবাই আসামী।

➢ **পাঠক:** ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদে বিশ্বাসীদের কাছে পড়ুয়া এক তালিবুল ইলম, যার অনুসৃত এ মুহূর্তে বৌদ্ধদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে, তাদেরকে অস্ত্রবিহীন জিহাদের সংজ্ঞা বুঝিয়ে এখন এক মাসের সফরে ইহুদী-খ্রিস্টানদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন এবং অস্ত্রবিহীন জিহাদের সংজ্ঞা মুখস্থ করছেন এবং করিয়ে চলেছেন।

ভাবনা: এ বইয়ের লেখক ইহুদী-খ্রিস্টানের দালাল।

লেখকের জবানবন্দি: ছোট ভাই মনে হয় ইহুদী-খ্রিস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ ও তাদের দালালদের যৌথ মহড়ার ছবি, ভিডিও, অডিওগুলো কখনো দেখেনি। উভয়ের যৌথ বিবৃতি, বক্তব্য ও লেখাগুলো দেখেনি। দেখলে চেহারাগুলো চিনতে এত কষ্ট হত না।

আর ছোট ভাই! সমস্যাগুলো সঠিক হয়ে থাকলে বাঁচার চেষ্টা কর, বাঁচানোর চেষ্টা কর। লেখকের দুর্বলতার কারণে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না।

➢ **পাঠক:** উচ্চতর মাদরাসার সিনিয়র উস্তায।

ভাবনা: (না পড়েই ছাত্রদের থেকে বইয়ের কিছু বক্তব্য শুনে বই ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়ে) এ লেখক কি শায়খুল হাদীস সাহেব, আমিনী সাহেবদের থেকেও বেশি বোঝে? আমরা অর্থ কালেকশনের সময় মানুষের প্রতি হুসনে যন্-সুধারণা রাখি।

লেখকের জবানবন্দি: বইটি নিজে পড়ে দেখলে হয়তো মুহতারামের এ পেরেশানিটুকু হতো না। এ লেখক শুধুমাত্র নিজের কষ্টের কথা এবং বিপরীতমুখী জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজছে।

- **পাঠক:** তরুণ মাদরাসা শিক্ষক।

ভাবনা: লোকটা আহলে হাদীস-গায়রে মুকাল্লিদ।
লেখকের জবানবন্দি: আমার জীবনের সর্ব প্রথম ছাপানো বই আহলে হাদীস-গায়রে মুকাল্লিদদের আসল চেহারা উন্মোচন বিষয়ে। ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার মকাম নিয়ে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই লিখেছি। হানাফী মাযহাবের পক্ষে সিরিজ আকারে বই চলছে। নিয়মিত এ বিষয়ে সেমিনার করে চলেছি। শ্রদ্ধেয় পাঠক! আমি আর কি করতে পারি?!

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

يظنون أن الدين لبيك في الفلا ❑ وفعل صلاة والسكوت عن الملا

وسالم وخالط من لذا الدين قد قلا ❑ وما الدين إلا الحب والبغض والولا

كذاك البرا من كل غاو وآثم

লেখকের যেসব বই বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে:

আবু হানিফা রহ. ও ইলমে হাদীস

(হাদীস অর্জন, যাচাই ও যাচাইয়ের মূলনীতি উদ্ভাবন, বর্ণনা, সংকলন, অনুসরণ ও অনুসরণের মূলনীতি উদ্ভাবন, সংরক্ষণের মূলনীতি উদ্ভাবনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অবদান)

ইত্তিবায়ে রাসূল সিরিজ ১-৮

সিরিজ-১ হাদীসের অনুসারীদের প্রতি

সিরিজ-২ মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির কিছু প্রশ্নের জবাব
সিরিজ-৩ সালাতুত তারাবীহ
সিরিজ-৪ তিন তালাকের বিধান
সিরিজ-৫ جزء طلاق الثلاث
সিরিজ-৬ পুরুষ-মহিলার নামাযের পার্থক্য
সিরিজ-৭ জানাযা ও গায়েবানা জানাযার নামায
সিরিজ-৮ সালাতুল বিত্‌র

আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ ১-২-৩

সিরিজ-১ "দারুল উলূম দেওবন্দ" পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি
সিরিজ-২ "দারুল উলূম দেওবন্দ" এর শত্রু-মিত্র
সিরিজ-৩ "দারুল উলূম" থেকে এতিমখানা-লিল্লাহবোর্ডিং